নতুন চিঠি

কার্ল মার্কস-এর জন্ম দ্বি-শতবর্ষ
‘ক্যাপিটাল’ প্রকাশনার সার্ধশতবর্ষ
নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ

বিশেষ সংখ্যা ২০১৭

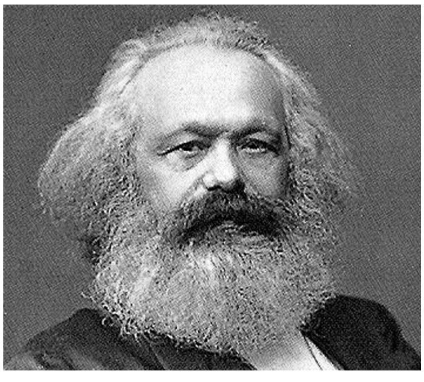

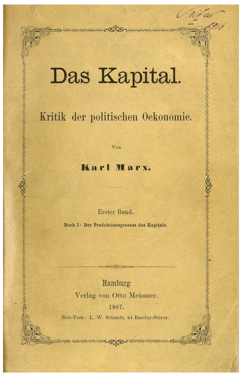

সম্পাদক

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

প্রকাশক

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা সহযোগিতায়

অরুণ মজুমদার, জহুর আলম, শিবানন্দ পাল,
কাজি আব্দুল করিম, কিশোর মাকর, মুরারী মণ্ডল,
দিনেশ ঝা, পার্থ চৌধুরী, ফজলুল বারি মিদ্দা

অক্ষরবিন্যাস ঃ শ্যামসুন্দর বেরা

প্রচ্ছদ ঃ আবদুল্লা মিদ্দা

ব্যবস্থাপনা সহযোগ ঃ আবদুস সবুর

মুদ্রণ ঃ নতুন চিঠি প্রেস
৬২, বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

মুদ্রণ সহযোগিতায় ঃ সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রাক্‌কথন

তিনটি কারণে ২০১৭ সালটি বিশ্ব-ইতিহাসের এক উজ্জ্বল স্মারক-বর্ষ। সমাজ-পরিবর্তনের বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মের জনক কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮১৮ সালের ৫ মে। এ-বছরটি তাঁর দ্বিশততম জন্মবর্ষ। শোষণ-ভিত্তিক পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ও তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিক-নির্দেশক চার-খণ্ডে বিন্যস্ত তাঁর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ ‘ক্যাপিটাল’-এর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৭ সালে, আজ থেকে দেড়-শো বছর আগে। এবং ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মার্কসবাদের পথ-নির্দেশনায় লেনিন-এর নেতৃত্বে পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ায় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের শতবর্ষের স্মারক এই বছরটি। তাই ২০১৭ সাল আমাদের স্মরণ করায় মার্কসবাদের প্রথম পাঠ হিসাবে মার্কসের জীবন ও কর্মধারা অধ্যয়ন, মার্কসবাদের আকর গ্রন্থ ‘ক্যাপিটাল’-এর অর্থোপলব্ধি ও তার নির্দেশনার আত্মীকরণ এবং মার্কসবাদ-নির্দেশিত পথে রাশিয়ার নভেম্বর-বিপ্লবের ঐতিহাসিক সার্থকতা, তার বিপুল কৃতিত্ব ও সেই সঙ্গে তার পতনের কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের সঠিক যাত্রাপথ নির্ণয়ের আবশ্যিকতাকে।

আমাদের এ-ও স্মরণে রাখতে হবে যে মার্কস তাঁর বিশ্ববীক্ষাকে শুধু ইউরোপীয় পরিপ্রেক্ষিতেই আবদ্ধ রাখেননি। এশীয় তথা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মতো ব্যতিক্রমী পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয়েও তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। রাশিয়ার Otechestvenniye Zapisski পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে এন কে মিখাইলোভস্কি-র একটি নিবন্ধের প্রত্যুত্তরে ১৮৭৭ সালের নভেম্বরে একটি চিঠিতে মার্কস লিখেছিলেন, নিবন্ধকার পশ্চিম ইওরোপে পুঁজিবাদের উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর (মার্কসের) খসড়াকে প্রতিটি দেশের বিকাশধারার, সে দেশের নিজস্ব ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত যা-ই হোক না কেন, দৈব-নির্দিষ্ট এক সর্বজনীন ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে দেখাতে চান। ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে অবিকল একই ধরনের ঘটনাও ভিন্ন ভিন্ন ফল দিতে পারে। প্রত্যেকটি বিবর্তনের রূপকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা এবং একের সঙ্গে অপরের তুলনার মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত সূত্রে পৌঁছানো সম্ভব। কিন্তু একটি ঐতিহাসিক-দার্শনিক তত্ত্বকেই সকল দরজা খোলার মহাচাবি (Master Key) হিসাবে ব্যবহার করতে গেলে তা একটি অতি-ঐতিহাসিক (supra-historical) প্রয়াসে পরিণত হতে বাধ্য।

মার্কসবাদ তাই অবশ্যই সমাজ-পরিবর্তনের একটি প্রয়োগ-সিদ্ধ বিজ্ঞান, কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি একটি সমাজবিজ্ঞান। প্রাকৃতিক বা ভৌত বিজ্ঞানের মতো তার গতি ও অভিমুখ সর্বদা সুনির্দিষ্ট ও পূর্বানুমানযোগ্য নয়। মানুষই সমাজ গড়ে এবং সমাজ পাল্টায়। কিন্তু সমাজের নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত একটি দিক আছে বলে যেমন খুশি তেমনভাবে মানুষ তা পারে না। যেমন ব্যতিক্রমী এশীয় ব্যবস্থা (Asiatic System) হিসাবে বর্ণিত ভারতের ক্ষেত্রে তার বর্ণ বা জাতব্যবস্থা (caste system) ও তৎসংলগ্ন অস্পৃশ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্যকে এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে সার্থকভাবে শ্রেণি-বিভাজনে উত্তীর্ণ করার উপর নির্ভর করছে ভারতীয় বিপ্লবের সার্থকতা। অন্যদিকে বস্তুগত পরিস্থিতি যতই বিপ্রবের অনুকূল হোক না কেন, বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত চেতনা এবং সংগঠন ও সংগ্রামই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। মার্কসবাদের সার্থক প্রয়োগ বস্তুগত ও চেতনাগত এই দ্বৈত উপাদানের সম্মিলনেই সম্ভব।

‘নতুন চিঠি’-র এই বিশেষ সংখ্যার প্রবন্ধগুলিতে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়গুলিই আলোচিত হয়েছে। পাঠকদের অভিমত পেলে আমরা সমৃদ্ধ হবো।

সূচিপত্র

কার্ল মার্কস ঃ জীবন ও কৃতি ... ৫

অন্তরঙ্গ মার্কস
রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৯

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের স্রষ্টা কার্ল মার্কস
অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ... ১২

কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ, মার্কসবাদ ও ভারত
হরিহর ভট্টাচার্য ... ১৭

দাস ক্যাপিটাল এখনো কেন প্রাসঙ্গিক?
পুঁজির দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা
অরূপ চট্টোপাধ্যায় ... ২১

'ক্যাপিটাল'—মার্কস ও পিকেটি একটি প্রাথমিক অবলোকন
জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ... ২৫

রাশিয়ায় দ্বৈতবিপ্লব ঃ ইতিহাস সৃষ্টির ইতিকথা
কল্যাণ সান্যাল ... ২৭

লেনিন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ
সুধীর রায় ... ৩০

প্রেরণার উৎস নভেম্বর বিপ্লব
শিবানন্দ পাল ... ৩২

শিল্প-সংস্কৃতি ঃ মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ
সুকৃতি ঘোষাল ... ৩৩

কালপঞ্জি

কার্ল মার্কস ঃ জীবন ও কৃতি

১৮১৮—৫ মে মার্কসের জন্ম জার্মানির ত্রিয়ের শহরে।

বিদ্যালয়-শিক্ষা শেষে Reflections of a Youth upon Choosing a Profession নামক রচনায় মার্কস মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ ঘোষণা করেন। এর পর বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নেন।

১৮৪১—জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস-এর বস্তুবাদী দর্শনের উপর পি এইচ ডি সম্পন্ন করেন।

১৮৪২—Rheinische Zeitung পত্রিকায় যোগ দেন এবং তার সম্পাদক হন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রগতিশীল সমালোচনার সুযোগ নেই এই বিশ্বাস থেকে অধ্যাপনার পেশা না নিয়ে সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করেন। 'যা-কিছু চলছে' তার নির্মম সমালোচনাকেই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। সরকার যে কেবল অভিজাত ও ধর্মযাজকদের স্বার্থ দেখছে এ-ব্যাপারে তিনি নিঃসংশয় হন। অর্থনৈতিক সম্পর্কের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। জার্মানির শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ফ্রান্সে লিয়ন তাঁতিদের বিদ্রোহ (১৮৩১ ও ৩৪), এবং ব্রিটেনে ১৮৩০-এর শ্রমিক আন্দোলন ও ১৮৪২-এর চার্টিস্ট আন্দোলন তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। আধা-সামন্ততান্ত্রিক জার্মানিতে তখন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। পত্রিকায় পরপর অনেকগুলি নিবন্ধে তিনি শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা তুলে ধরেন। বস্তুবাদী ও কমিউনিস্ট ভাবধারায় উত্তরণের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। এই পত্রিকা অফিসেই এঙ্গেলস-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়।

১৮৪৩—Rheinische Zeitung পত্রিকার উপর সরকারি কোপ নেমে আসে। পত্রিকার অংশীদাররা নরমপন্থা নেবার জন্য চাপ দিলে মার্কস পদত্যাগ করেন।

* Critique of the Hegelian Philosophy of Right শীর্ষক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধে ও সমকালীন পত্রাবলীতে ফায়েরবাখ ও হেগেল-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও সমালোচনার মাধ্যমে মার্কস গুণগতভাবে আলাদা এক বস্তুবাদের জন্ম দেন। ফায়েরবাখ প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে বস্তুবাদী হলেও ইতিহাস এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে ভাববাদী ছিলেন। তাঁর বস্তুবাদও ছিল যান্ত্রিক ও অধিবিদ্যাবাদী। মার্কস বস্তুবাদকে ,সমাজ-বিশ্লেষণে প্রসারিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকেও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান না করে তার 'যুক্তিসিদ্ধ সারবস্তু'-কে ভাববাদ থেকে মুক্ত করে বস্তুবাদের সঙ্গে সমন্বিত করতে প্রয়াসী হলেন। ফলে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদী এক নতুন বিশ্ববীক্ষার উন্মেষ ঘটে।

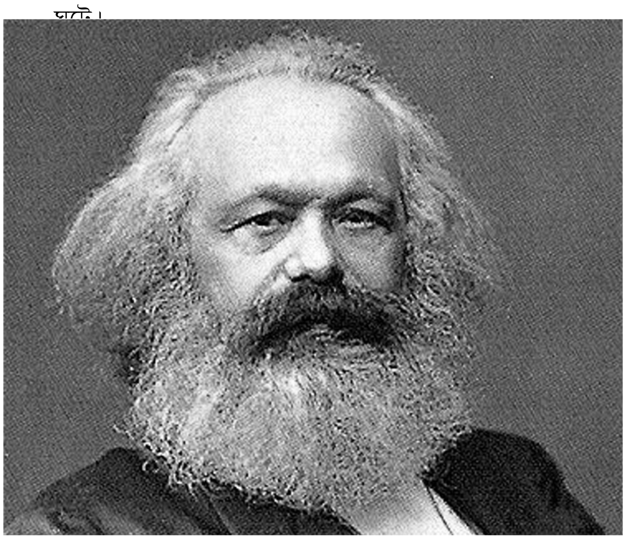

থেকে বস্তুবাদ, বিপ্লবী গণতান্ত্রিকতা থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Jewish Question গ্রন্থে মার্কস হেগেলপন্থী ব্রুনো বাওয়ারের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেন। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সংযোগ যে ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি উভয়কেই কলুষিত করে তা তুলে ধরেন। বুর্জোয়া বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও আভাষিত হয়।

Critique of the Hegelian Philosophy of Right শীর্ষক অসাধারণ নিবন্ধে মার্কস ধর্মের সমালোচনাকে যে-বাস্তবতা ধর্মের জন্ম দেয় তার বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেবার

কথা বলেন। তাঁর ভাষায়—

সমালোচনার অস্ত্র অবশ্য অস্ত্রের সমালোচনার পরিবর্ত নয়, বস্তুগত শক্তিকে বস্তুগত শক্তি দিয়েই প্রতিহত করতে হবে, কিন্তু তত্ত্বও যখন গণচেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তখন তা বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হয়। সেই তত্ত্বই গণচেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে যদি তা তাদের মৌলিক স্বার্থকে প্রতিফলিত করে। অবস্থানগত কারণে একমাত্র সর্বহারারাই পারে বিপ্লবী তত্ত্বের বাহক হতে। দর্শন যেমন সর্বহারার মধ্যে খুঁজে পায় তার বস্তুগত অস্ত্র, তেমনি দর্শনের মধ্যেই সর্বহারা খুঁজে পায় তার চৈতন্যের অস্ত্র।

এইভাবে মার্কস সর্বহারার বিশ্ব-ঐতিহাসিক ভূমিকার সূত্রায়ন করলেন। তাঁর মানবসেবার প্রাথমিক আদর্শ উত্তীর্ণ হলো শ্রমিক শ্রেণির শোষণমুক্তির আদর্শে।

এঙ্গেলসও এই বছর প্যারিসে চলে আসেন এবং মার্কস ও এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক যুগ্ম প্রয়াস শুরু হয়। তাঁদের যুগ্ম রচনা The Holy Family-তে নবীন হেগেলপন্থী ব্রুনো বাওয়ার ও তাঁর সহচিন্তকদের ভাববাদী দর্শনের বিধ্বংসী সমালোচনা করে তাঁরা বললেন

বীরেরা নয়, জনগণই ইতিহাস রচনা করে। শ্রমিক শ্রেণিই সেই সামাজিক শক্তি যা সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

এইভাবে কল্পবাদী সমাজতন্ত্রের বদলে বস্তুবাদী দর্শনের রূপরেখা ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচিত হলো।

মার্কসের লেখায় কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি, প্রাশিয়া-বিরোধী মনোভাব ও সাইলেসিয়ান তাঁতিদের বিদ্রোহের প্রতি সমর্থনের প্রকাশ ঘটায় মার্কসের সঙ্গে আর্নল্ড রুজ-এর মতভেদ ঘটে। প্রাশিয়ান সরকারের চাপে ফ্রান্স সরকার মার্কস ও পত্রিকার কয়েকজন কর্মীকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয়। মার্কস বেলজিয়াম-এর ব্রুসেলসে চলে আসেন।

১৮৪৫—বেলজিয়ামে অবস্থানকালেও জার্মান আক্রোশ মার্কসকে তাড়া করে। ফলে তিনি জার্মান নাগরিকত্বই খারিজ করে দেন।

Thesis on Feuerbach গ্রন্থে মার্কসের সেই কালজয়ী উক্তি—

দর্শনের কাজ পৃথিবীকে শুধু ব্যাখ্যা করা নয়, তাকে পরিবর্তন করা।

১৮৪৬—মার্কস ও এঙ্গেলস যুগ্মভাবে রচনা করেন German Ideology (১৯৩২ সাল পর্যন্ত অপ্রকাশিত)। এই গ্রন্থে রয়েছে হেগেলের ভাববাদী দর্শন ও নব্য হেগেলপন্থীদের মন্ময় ভাববাদ এবং অন্যদিকে ফায়েরবাখীয় যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিশদ সমালোচনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক ধারণাগুলির সূত্রায়ন। রয়েছে বস্তুগত উৎপাদনের মৌলিক ভূমিকা, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, অনিবার্য প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক বিকাশ, শ্রেণি-সংগ্রাম, সর্বহারার বিপ্লব ও ক্ষমতাদখলের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং সাম্যবাদের পথে যাত্রা—এককথায় মার্কসবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রমিকশ্রেণির চেতনাগত করার জন্য বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রী ও প্রাগ্রসর শ্রমিকদের এক মঞ্চে নিয়ে আসার লক্ষ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস Communist Correspondence Committee স্থাপন করেন। ভাইটলিং-এর স্থূল সাম্যবাদ, ট্রু সোস্যলিজম-এর নামে শ্রেণিবিরোধকে মসৃণ করার জন্য দরদ ও সৌভ্রাত্রের দর্শন, পুঁজিবাদকে সংশোধন করার প্রুধঁবাদী দর্শন ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়া মতবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে ব্রতী হন।

১৮৪৭—প্রুধঁ-র Philosophy of Poverty-র জবাবে মার্কস Poverty of Philosophy রচনার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেন। রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখান শোষণ, দারিদ্র ও সংকট পুঁজিবাদেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার অবসানের মাধ্যমেই একমাত্র তার অবসান সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রামই রাজনৈতিক সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়। পুঁজিবাদ ধ্বংসের জন্য শ্রমিকশ্রেণির রণকৌশলের সূত্রায়ন করেন।

ইতোমধ্যে League of the Just জার্মান ছাড়াও অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের সংযুক্ত করেছে। তাকে পুনঃসংগঠিত করার জন্য সংগঠনের নেতৃত্ব মার্কস ও এঙ্গেলসকে আহ্বান জানায়। তাঁরা সম্মত হন।

জুনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে League of the Just সংগঠনের নামকরণ হয় Communist League। সংগঠনের আদর্শবাক্য All men are brothers বদলে করা হয় *Workers of all countries unite*—শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিকতার শ্লোগান হিসাবে যা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনের নিয়মকানুন রচনা করেন এঙ্গেলস। প্রথম অনুচ্ছেদেই বুর্জোয়া শাসন উৎখাত করে সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিবৈরিতার উপর ভিত্তিশীল বুর্জোয়া সমাজের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণিহীন ও ব্যক্তিগত মালিকানাহীন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষিত হয়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে Communist League-এর দ্বিতীয় কংগ্রেস হয় লন্ডনে। লিগের নিয়ম ও নীতি গৃহীত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসকে ইস্তেহার রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য Democratic Association স্থাপিত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করতেন সর্বহারার কর্তব্য সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা। তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত Deutsche Brusseler Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কয়েকটি নিবন্ধে তাঁরা জার্মানিতে আসন্ন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন যে এই বিপ্লবই চূড়ান্ত নয়, সর্বহারা বিপ্লবে পৌঁছোবার একটি ধাপ মাত্র। এই বক্তব্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্বের বীজ নিহিত।

১৮৪৮—বেলজিয়াম সরকার মার্কসকে গ্রেপ্তার করে ও দেশত্যাগে বাধ্য করে। তিনি আবার প্যারিসে চলে আসেন। ফ্রান্স তখন ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কম্পিত।

মার্কস Communist League-এর কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

ফেব্রুয়ারিতে Communist League-এর মুদ্রিত ইস্তেহার Communist Manifesto প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের এই কর্মসূচির উদ্ভব সম্ভব হল অস্তিমান সমস্ত তত্ত্বের সমালোচনা এবং শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব ও তার সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সাধারণীকৃত এক অসাধারণ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত হিসাবে। এর মধ্যে আছে এক নতুন বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা যা সমাজজীবনকেও অন্তর্ভুক্ত করে, সমাজের দ্বান্দ্বিক বিকাশ ও তার স্তরপরম্পরা নির্দেশ করে, পুঁজিবাদী সমাজের শোষণভিত্তিক চরিত্রকে অবারিত করে, এবং সমাজ পরিবর্তনে শ্রেণিসংগ্রাম, সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা ও নতুন এক সাম্যবাদী সমাজের স্রষ্টা হিসাবে তার বিপ্লবী ভূমিকা ও তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ভূমিকাকে তুলে ধরে।

জার্মানিতে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা। মার্চ মাসে মার্কস ও এঙ্গেলস রচিত 'জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি' শীর্ষক একটি দলিল কমিউনিস্ট লিগের দ্বারা গৃহীত হয় ও সারা জার্মানিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এপ্রিলের প্রথমে মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মানিতে ফিরে আসেন। Neue Rheinische Zeitung পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। পত্রিকায় একের পর এক নিবন্ধে শ্রমিকশ্রেণিকে সংগঠিত করার অক্লান্ত প্রয়াস নেন। জার্মানির পশ্চাৎপদতার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বহারা বিপ্লবের একটি স্তর হিসেবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংগ্রামরত জনগণের প্রতি সমর্থন জানান। বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে রত হন।

১৮৪৯—বিদ্রোহ সৃষ্টির অভিযোগে মার্কস অভিযুক্ত হন কিন্তু মুক্তি পান।

Wage, Labour and Capital গ্রন্থে মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সম্পর্ক, শোষণ, শ্রেণিসংগ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তি ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেন।

ডেমোক্রেটিক সোসাইটি ত্যাগ করে মার্কস কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ নেন। গণবিদ্রোহগুলিকে সমর্থন জানান। পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। শেষ মে সংখ্যা লাল কালিতে ছাপা হয়।

'বিদেশি' এই অভিযোগে মার্কস জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত হন।

মার্কস প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু সেখান থেকেও বহিষ্কৃত হন।

মার্কস লন্ডনে আসেন। এঙ্গেলসও এসে মিলিত হন।

১৮৫০—জার্মান বিপ্লব প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট লিগের অতিবাম গোষ্ঠীর সঙ্গে মার্কসের মতভেদ হয়। লিগের কেন্দ্রীয় অফিস লন্ডন থেকে জার্মানির কোলনে স্থানান্তরিত হয়।

মার্কসের The Class Struggle in France, 1848 to 1850 গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অসাধারণ প্রয়োগ। শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব এবং কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ওপর গুরুত্ব। বিপ্লব-পরবর্তী শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের উল্লেখ। দু-বছর পরেই Wedemeyer-এর কছে চিঠিতে যা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়।

দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম। পুত্র গিডো-র মৃত্যু সত্ত্বেও মার্কস ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সুগভীর অধ্যয়ন শুরু করেন।

১৮৫১—জার্মানিতে কোলন কমিউনিস্টদের ওপর অত্যাচার, বিচার ও শাস্তি। মার্কসের প্রচারপত্র—Revelations of the Cologne Communist Trial.

Newyork Daily Tribune পত্রিকায় মার্কস ইউরোপীয় প্রতিবেদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ শুরু করেন।

১৮৫২—কমিউনিস্ট লিগের অবসান ঘটে।

Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte গ্রন্থে মার্কস পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

Wedemeyer-এর কাছে চিঠিতে মার্কস সর্বহারার একনায়কত্বের উল্লেখ করেন।

কন্যা ফ্রান্সিসকার মৃত্যু হয়।

১৮৫৩—Newyork Daily Tribune পত্রিকায় মার্কসের ভারত-বিষয়ক রচনাবলীর শুরু।

১৮৫৭—ভারতের মহাবিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করে মার্কস তাকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করেন।

An Outline of the Critique of Political Economy (Grundrisse) গ্রন্থে মার্কস বুর্জোয়া রাষ্ট্রনীতির সমালোচনা ও উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্বের রূপরেখা নির্ণয় করেন, যা পরে 'Capital' গ্রন্থে পূর্ণ রূপ পায়।

১৮৫৯—A Contribution to the Critique of Political Economy গ্রন্থে মার্কস মূল্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। গ্রন্থটির মুখবন্ধে রয়েছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিখ্যাত সূত্রায়ন।

১৮৬০—কনিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জার্মানিতে Karl Vogt-এর বিষোদ্গারের তীব্র জবাব দেন মার্কস।

১৮৬১—মার্কস জার্মান শ্রমিক-আন্দোলনের নেতা লাসালের আপসপন্থার তীব্র সমালোচনা করেন।

সুকঠোর দারিদ্র ও এঙ্গেলসের সাহায্য।

'Capital' মহাগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

১৮৬২—'Theories of Susplus Value' গ্রন্থে মার্কস বিভিন্ন মূল্যতত্ত্ব ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশদ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেন। (১৯০৫ সালে কাউটস্কি কর্তৃক তা প্রথম প্রকাশিত হয়।)

১৮৬৩—মার্কসের মাতার মৃত্যু।

১৮৬৪—মার্কসের নেতৃত্বে লন্ডনে প্রথম আন্তর্জাতিক International Workingmen's Association স্থাপন। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন মার্কস।

১৮৬৫—অনিদ্রা, অসুস্থতা, দারিদ্র ও দুঃসহ ঋণভার সত্ত্বেও মার্কস 'Capital' গ্রন্থের তিন খণ্ডের খসড়া শেষ করেন।

আন্তর্জাতিকের লন্ডন কনফারেন্স। General Council-এ মার্কসের ভাষণ।

Wages, Price and Profit গ্রন্থে মার্কস প্রকাশিতব্য Capital গ্রন্থের মূল কথাগুলির সহজ বর্ণনা করেন। (কন্যা এলিয়েনর কর্তৃক ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।)

১৮৬৬—আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেস। মার্কস উপস্থিত হতে পারেননি।

১৮৬৭—Capital, *A Critique of Political Economy* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ। বিষয়—উৎপাদনী পুঁজি। এঙ্গেলসের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া প্রকাশ সম্ভব হত না বলে মার্কসের স্বীকৃতি।

Capital গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড এঙ্গেলস প্রকাশ করেন। মার্কসের মৃত্যর পর যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়—পুঁজির প্রচলন, অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক সংকট। তৃতীয় খণ্ডের বিষয় ‖ পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সামগ্রিক চিত্র এবং মুনাফার চরিত্র বিশ্লেষণ। চতুর্থ খণ্ডটি ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় কার্ল কাউটস্কির উদ্যোগে। বিষয় ‖ উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

১৮৬৮—আন্তর্জাতিকের ব্রুসেলস্ কংগ্রেস। লিবনেখ্‌ট ও ব্যাবেল-এর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনগুলি যোগদান করে। লাসালবাদের প্রতিরোধ।

১৮৬৯—আন্তর্জাতিকের বাস্‌ল কংগ্রেস। প্রুধোঁপন্থীদের মতাদর্শগত পরাজয়।

মার্কসের উৎসাহে লিবনেখ্‌ট ও ব্যাবেল-এর নেতৃত্বে Social Democratic Workers' Party of Germany-র প্রতিষ্ঠা।

১৮৭০—এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টার ছেড়ে লন্ডনে মার্কসের সান্নিধ্যে চলে আসেন।

১৮৭১—প্যারি কমিউন ও তার পতন। The Civil War in France গ্রন্থে মার্কস প্যারি কমিউনকে সর্বহারার রাষ্ট্রের প্রথম রূপ হিসেবে অভিহিত এবং অভিনন্দিত করেন ও তার পতনের কারণ বিশ্লেষণ করেন। Kugelmann-এর কাছে পত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা এবং প্যারি কমিউন-এর অনুরূপ প্রচেষ্টার সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

আন্তর্জাতিকের লন্ডন কংগ্রেসে বাকুনিন-এর নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

১৮৭২—আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেস—শেষ কংগ্রেস। শ্রমিকশ্রেণির পার্টির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। বাকুনিন বহিষ্কৃত হন। General Council-এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৭৪—নিদারুণ অভাব ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে মার্কসের স্বাস্থ্যভঙ্গ।

১৮৭৫—Critique of the Gotha Programme গ্রন্থে বিশদ সমালোচনার মধ্য দিয়ে মার্কস পুঁজিতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ এবং এই উত্তরণের দুটি স্তরের বিশ্লেষণ করেন।

১৮৭৮—এঙ্গেলস-এর Anti-Duhring রচনায় মার্কসের সাহায্য ও সহযোগিতা।

১৮৭৯—বিসমার্কের সমাজতন্ত্র-দমন আইনের মুখে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সংকট।

Circular Letter—মার্কস কর্তৃক শ্রেণি-আপস নীতির তীব্র সমালোচনা এবং আইনি ও বেআইনি উভয়বিধ পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ।

১৮৮০—Workers' Party of France-এর কর্মসূচি প্রণয়নে মার্কসের সহযোগিতা।

ভারতীয় ইতিহাস চর্চায় মার্কস মনোনিবেশ করেন। Notes on Indian History গ্রন্থে ৬৬৪ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জি প্রণয়ন করেন।

১৮৮১—মার্কসের স্ত্রী জেনি-র মৃত্যু। মার্কসের স্বাস্থ্যের অবনতি।

১৮৮২ --- Communist Manifesto-র দ্বিতীয় রাশিয়ান সংস্করণে মার্কসের ভূমিকায় রাশিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনার উপলব্ধি।

১৮৮৩—মার্কসের মৃত্যু।

কার্ল মার্কস

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

খুলে যায় সব দৃশ্য একে একে সম্মুখে সবার
কী উৎসুকে আত্মমগ্ন ছিলে তুমি বিশ্ববোধে একা
ইতিহাস খুঁজে গেছ তন্নতন্ন করে অবিরাম
বাকি তো ছিল না কিছু শ্রেণিস্বার্থে প্রমুখ দেখা।

উদ্‌ঘাটন করেছিলে সে-প্রেক্ষিত প্রতিদিন যত
নেমেছে অধিক ততো রাষ্ট্র রোষে নির্দয় তাড়না
দেশ ছাড়া, কষ্টে দিন, সংসারের মৃত্যু শোকে স্থির
আদর্শে অটল তবু চূর্ণ করো সমস্ত ছলনা।

খুলে যায় জনমনে সৃষ্টিশীল নতুন আলোক
মুক্তির বাতাসে কাঁপে শোষকের উচাটন মন
ম্লান হয়, চিড় ধরে, দুর্নিবার উদাত্ত মিছিলে
রক্ত-মূল্যে গড়া নিত্য জীবনের বিপ্লবী মনন।

আজ সেই নীতি নেই অনুজ্জ্বল বোধের আকাশ
মানবিক মূল্য নেই তবু রাখি তোমাতে বিশ্বাস।

অন্তরঙ্গ মার্কস

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

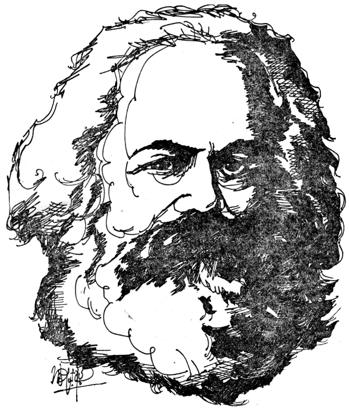

মার্কস বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির অধিকারী। কিন্তু বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মের তাড়নায় সাংসারিক জীবনে তাঁর অভাব-অনটনের শেষ ছিল না। জীবিকার সূত্র তো লেখাপড়া। তা লিখে কতই বা পেতেন! তবে অভাব-মোচনে এঙ্গেল্‌স্ প্রায়ই এগিয়ে আসতেন—এই যা ভরসা। তবু অভাব মার্কসকে দমাতে পারেনি। তাঁর লেখাপড়ায় কোনদিনই বিরাম পড়েনি। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি—সবই ছিল তাঁর পাঠক্রমের মধ্যে।

কার্ল মার্কস—অগ্নি-অক্ষরে লেখা একটি নাম—যে নামের সঙ্গে যুক্ত মতবাদ কোটি কোটি শোষিত ও পীড়িত মানুষের জীবনের পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা। এই মার্কসের মনীষা ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সভ্যতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। স্বাভাবিক ভাবেই মার্কসবাদের মতো মার্কসের সম্পর্কেও আমাদের অদম্য কৌতূহল। মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, কীভাবে তাঁর দিন কাটত এসব জানতে আমাদের অপার আগ্রহ। সেই আগ্রহের বশবর্তী হয়ে মার্কসের অন্তরঙ্গ পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছি।

মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেল্‌স্-এর নাম অভিন্ন ভাবে জড়িত। যৌবনে দু-জনের নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মার্কসের মৃত্যুদিন পর্যন্ত সে বন্ধুত্ব অটুট ছিল। মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ নিবিড় সখ্যর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এঙ্গেল্‌স্ মার্কসের চিন্তা ও কর্মের একান্ত সহযোগী। মার্কস প্রসঙ্গে এঙ্গেলস অপরিহার্য।

মার্কস সুগঠিত দেহের অধিকারী। লম্বা চওড়া চেহারা। প্রশস্ত কাঁধ ও বুক। ঊর্ধ্বাঙ্গের তুলনায় নিম্নাঙ্গ কিঞ্চিৎ খর্ব। গায়ের রং শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ময়লা। মাথায় একরাশ চুল, মুখে ঘন-দাড়ি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির অধিকারী। কিন্তু বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মের তাড়নায় সাংসারিক জীবনে তাঁর অভাব-অনটনের শেষ ছিল না। জীবিকার সূত্র তো লেখাপড়া। তা লিখে কতই বা পেতেন! তবে অভাব-মোচনে এঙ্গেল্‌স্ প্রায়ই এগিয়ে আসতেন—এই যা ভরসা। তবু অভাব মার্কসকে দমাতে পারেনি। তাঁর লেখাপড়ায় কোনদিনই বিরাম পড়েনি। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি—সবই তাঁর পাঠক্রমের মধ্যে। আর সবকিছুই খুঁটিয়ে পড়তেন।

পড়তে পড়তে, যেখানে যেমন মনে হত, কোথাও জিজ্ঞাসার, কোথাও বা বিস্ময়ের চিহ্ন দিতেন। কোথাও বা দাগ দিয়ে রাখতেন। প্রয়োজন হলে দরকারি অংশ সহজেই বের করতে পারতেন।

মার্কস ব্রিটিশ মিউজিয়মের নিয়মিত পাঠক। তাঁর নিজের সংগ্রহেও অজস্র বই। বইগুলো যেমন তেমন সাজান থাকতো। কিন্তু কোন্‌টা কোথায়—সবই মার্কসের নখদর্পণে।

মার্কস পড়তে পড়তে ভাবতেন। ভাবনার সময় মেঝের ওপর পায়চারি করতেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চলত বিষয়বিন্যাস। বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য মনে হলে তখনই সেটা নোট করতেন। অবিশ্রাম খাটনি চলতো। বিশ্রাম বলতে মার্কস বুঝতেন একটি-বিষয় ছেড়ে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা।

মার্কস অনেকগুলো ভাষা জানতেন। মাতৃভাষা জার্মানি ছাড়া তিনি ফরাসি ও ইংরাজি এত ভাল জানতেন যে ঐসব ভাষাতেও তিনি স্বচ্ছন্দে লিখতেন। তাঁর ইংরেজি ও ফরাসি লেখা ধ্রুপদী ধরনের। গ্রিক, ল্যাটিন এবং স্প্যানিশ ভাষাতেও তাঁর অধিকার ছিল। ভাষা শেখার দিকে তাঁর সহজ প্রবণতা ছিল। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি রাশিয়ান শেখেন। এসব শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য মূল গ্রন্থ পাঠ। তাঁর আরবি শেখারও ইচ্ছে ছিল। তবে সেটা আর হয়ে ওঠেনি।

সাহিত্যে মার্কসের অসাধারণ অনুরাগ। ডুমা, স্কট এবং বালজাকের গল্প-উপন্যাস তাঁর খুব ভাল লাগতো। হাসির গল্প এবং অভিযান-কাহিনী তাঁকে খুব টানতো। তাছাড়া তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় অনেক কিছুই তাঁর মুখস্থ। গ্যেটে, হাইনে, দান্তে, শেক্সপিয়র থেকে তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। ডন কুইকসোট তাঁর বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ। এই বইটি পড়ার তাগিদেই তিনি স্প্যানিশ শেখেন। পুশকিন এবং গোগোলও তাঁর প্রিয় লেখক। যেটা ভাল লাগতো, সেটা বার বার পড়তেন, অপরকে পড়তে বলতেন।

মার্কস দারুণ চুরুট খেতেন। চিন্তামগ্ন থাকতেন বলে অনেক সময় চুরুট টানা হতো না। চুরুট নিবে যেতো। ফলে বারবার ধরাতে হতো। এজন্য দেশলাই-ও প্রচুর লাগতো। তাঁর অমর গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' চল্লিশ বছরের পরিশ্রমের ফসল। মার্কস বলতেন, এ বইতে যা টাকা পাওয়া যাবে, তাতে চুরুটের খরচা-ও উঠবে না।

মার্কস দারুণ হাঁটতেন। হাঁটতে হাঁটতে সহকর্মীদের সঙ্গে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করতেন। নিজের অসীম জ্ঞানতৃষ্ণা। তাই অপরকেও সব সময় পড়তে বলতেন। মার্কস একবার মাসছয়েক তরুণ সহকর্মীদের ক্লাস নিয়েছিলেন। পড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। পড়ুয়ারা কতটা শিখলো, তা রীতিমতো যাচাই করে নিতেন। তিনি নিজে ফাঁকি দিতেন না, অপরে ফাঁকি দিক—তা-ও চাইতেন না। তাঁর নিষ্ঠার নমুনা ক্যাপিটাল-এর সর্বত্র। ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা সম্পর্কে বইটিতে কুড়িটি পৃষ্ঠা আছে। এই কুড়ি পৃষ্ঠা লিখতে তিনি ইংরেজ সরকার প্রকাশিত যাবতীয় পুঁথিপত্র পড়ে ফেলেন। বইগুলি পার্লামেন্টের সদস্যদের জন্য ছাপা হতো। অনেক মাননীয় সদস্যই বইগুলির সদ্ব্যবহার করতেন ওজনদরে বেচে দিয়ে। মার্কস সেগুলি সস্তায় কিনে নিতেন, তন্ন তন্ন করে পড়তেন। তাই তাঁর লেখা এত তথ্যসমৃদ্ধ।

এ তো গেল চিন্তানায়ক মার্কসের কথা। এবার মার্কসের ঘরোয়া জীবনের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক।

মার্কস বিয়ে করেন জেনি ফন ওয়েস্টফ্যালেনকে। জেনি অভিজাত পরিবারের সন্তান। ভালবেসে যাঁকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর সুখদুঃখ হাসিমুখে বরণ করে নেন। করবেনেই বা না কেন? কপর্দকশূন্য হলে কী হল—মার্কস জেনিকে উদ্দেশ্য করে তিন খাতা ভর্তি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাগুলিকে জেনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য করতেন। পরবর্তী জীবনে মার্কস আর কবিতা লেখেননি। তবে কাব্যপ্রেম তাঁর শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। তার পরিচয় তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

মার্কসের জীবনের বেশির ভাগ কাটে নির্বাসনে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে। জার্মানি থেকে বেলজিয়াম, বেলজিয়াম থেকে প্যারিস। শেষ পর্যন্ত লণ্ডন। নির্বাসনদণ্ড জেনির ওপরও পড়তো। তাঁকেই সব গোছগাছ করে, দেনাপত্তর মিটিয়ে প্রবাস জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হতো। মার্কস-পরিবারের ওপর যখন প্যারিস ত্যাগের নোটিশ জারি হয়, তখন পরিবারের কী দুর্দশা। রোজগারপত্তর নেই। অথচ সব দায় মেটাতে হবে। মার্কস কাগজ চালাতেন, তার দায়ও কম নয়। ছাপাখানা, আসবাবপত্তর, গয়না—সব বেচে কর্মচারীদের বেতন চুকিয়ে দেন, অন্যান্য দায়ও মেটান। তারপর বিদেশে পাড়ি।

নির্বাসিত জীবনে অভাব-অনটন তো ছিলই। তার উপর ছিল তিনটি সন্তানের অকালমৃত্যুর তীব্র শোক। আর কী মর্মান্তিক সে শোক! মেয়ে মারা গেছে। হাতে পয়সা নেই। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হবে কী করে? একটি ঘরে মৃত শিশুটিকে রেখে অন্য ঘরে মেঝের ওপর মার্কস-দম্পতি জীবিত তিনটি শিশু-সন্তানকে নিয়ে রাত কাটান। পরে একজন ফরাসি বন্ধুর কাছ থেকে দু-পাউণ্ড জোগাড় করে মেয়ের শবাধার ও সমাধির ব্যবস্থা করেন। জেনি বড় দুঃখেই লিখেছিলেন, মেয়ে যখন পৃথিবীতে আসে, তার জন্যে একটা দোলনা পর্যন্ত ছিল না, আর মারা যাওয়ার পর তার শেষ-নিদ্রার শয্যাও জোটেনি!

শেষ পর্যন্ত তিনটি সন্তান বেঁচেছিল। মার্কস মেয়েদের দারুণ ভালবাসতেন। মেয়েদেরও বাবাকে নইলে চলতো না। রবিবারটা মেয়েরা সারাদিন বাবাকে দখল করে রাখতো। সেদিন আর মার্কস বইয়ের ধারে ঘেঁষতে পারতেন না। মেয়েদের গল্প শোনাতেন, তাদের সঙ্গে খেলা করতেন।

মজাটা জমতো যেদিন এঙ্গেলস আসতেন। এঙ্গেলস থাকতেন ম্যাঞ্চেস্টারে, মার্কস লণ্ডনে। এঙ্গেলস এলে মার্কস-পরিবারে সাড়া পড়ে যেত। প্রথমে চলতো দু-বন্ধুর চিন্তার বিনিময়। তারপর চলতো ভবিষ্যৎ কাজের পরিকল্পনা। কোনো বিষয়ে এঙ্গেলস ভিন্নমত পোষণ করলে, মার্কস তুমুল তর্ক করতেন। বিচার-বিতর্কের পর এঙ্গেলস যখন মার্কসের মতে মত দিতেন তখন মার্কসের ভাবখানা দেখার মতো—যেন বিশ্বজয় করেছেন!

তারপর মেয়েদের সঙ্গে খেলা। মেয়েরা এঙ্গেলসকে 'জেনারেল' বলে ডাকতো। আর মার্কসকে ডাকতো 'মুর' বলে। গায়ের রং ময়লা বলে মার্কসের এই 'মুর' নাম। অন্তরঙ্গ মহলেও মার্কসের ডাকনাম 'মুর'। যাহোক, মুর আর জেনারেল মেয়েদের সঙ্গে ঘোড়া ঘোড়া খেলতেন। তাঁরা হতেন ঘোড়া। আর মেয়েরা সওয়ার। তারপর চলতো হুটোপুটি। কোনো কোনোদিন জলযুদ্ধ হতো। এক গামলা জল, তার ওপর কাগজের জাহাজ ভাসিয়ে দেওয়া হতো। তারপর জাহাজগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো। তখন মজাটা তুঙ্গে উঠতো। কে বলবে ভাড়ার করি জোটাতে না পেরে এই পরিবারকে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়েছিল, খুচরো দেনা মেটাবার জন্যে বিছানা-পত্তর, পোষাক-আশাক—সব বেচতে হয়েছিল।

সে যাই হোক। সুযোগ পেলেই মার্কস-পরিবার ছুটির দিনে বাইরে বেরুতেন। মেয়েদের পথের কষ্ট ভুলাতে মার্কস রূপকথা বলতেন। অনেক গল্প বানিয়েও বলতেন। লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছনো পর্যন্ত সে গল্প কখনোই শেষ হতো না। সকলে মিলে পাহাড়ে চড়তেন। বুনো ফলের খোঁজে ছুটোছুটি করতেন। পথের ধারে কোনো সরাইতে খেয়ে নিতেন।

কোনো কোনো দিন জেনারেল থাকতেন। থাকতেন অনেক বিপ্লবী নেতা ও শ্রমিক। সকলে হুল্লোড় করতে করতে চলতেন। রসদ নিয়ে চলতেন হেলেন ডেমুথ। হেলেন জেনির আবাল্য পরিচারিকা, পরে মার্কস-পরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গিনী, কার্যত বাড়ির গিন্নী। একা জেনি সবকিছু সামলাতে পারতেন না। হেলেনই ঘর-গেরস্থালী দেখতেন। অবসর পেলে মার্কস তাঁর সঙ্গে দাবা খেলতেন। খেলায় প্রায়ই মার্কসের হার হতো।

যাই হোক, হুল্লোড় করতে করতে মার্কসবাহিনী বনভোজনে চলতেন। আর সে কী কাণ্ড! পথের ধারে বাদাম গাছে বাদাম ফলে আছে। অমনি ঢিল ছোঁড়া শুরু হতো। মার্কসও মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। শেষ পর্যন্ত গাছে একটা বাদামও থাকতো না। তার ধাক্কায় মার্কস বেশ কয়েকদিন ডান হাত নাড়তে পারতেন না।

সংসারের দায় কি এমন লোককে কখনও কাবু করতে পারে? প্রথম আন্তর্জাতিকের উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী বক্তৃতা তৈরি করবেন। কিন্তু ঘরে কাগজ নেই, পকেটে কাগজ কেনার পয়সা নেই। অগত্যা মার্কস গায়ের কোট বেচে কাগজ কেনেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের যাত্রা শুরু হলো—সে যাত্রা আজও থামেনি।

মার্কস বাচ্চাদের খুব ভালবাসতেন। এমনিতে তিনি ভিখিরিদের দেখতে পারতেন না। কিন্তু ছেঁড়া-খোঁড়া পোষাক পরা কোনো শিশুর করুণ মুখ দেখলে তিনি স্থির থকতে পারতেন না। তার হাতে যা হোক কিছু গুঁজে দিতেন।

মার্কস নারী-নির্যাতন সইতেন না। তখনকার দিনে খাস লণ্ডন শহরেও অনেক স্ত্রীকে স্বামীর হাতে ঠেঙানি খেতে হতো। একবার মার্কস লিব্‌নেখ্‌টের সঙ্গে বাস যাচ্ছেন। হঠাৎ
'খুন, খুন'। অমনি মা
থেকে নেমে
লিব্‌নেখ্‌টকেও নামে
ঝগড়া। মজা দেখতে
জড়ো হয়েছে। মার্ক
আর্তত্রাণে লেগে গে
ঝগড়ায় বিদেশিদের
সকলেই এককাট্টা।
করা দরকার। স্ত্রীলো
তাঁর দাড়ি ধরে টানে
পুলিশ এসে পড়ে।
গেলেন। তারপর
আবার বাসে।

মার্কসের হাতের
না। তাঁর হস্তাক্ষরে
কষ্টসাধ্য ব্যাপার। জেনি মার্কসের লেখা কপি করে ছাপাবার উপযোগী পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন। অবশ্য মার্কসের হাতের লেখা খারাপ না হলে কী যে হতো—তারও কাহিনিটি বলি। অভাবের তাড়নায় মার্কস ঠিক করলেন, চাকরি করবেন। তিনি বলতেন, এখন আমি পুরোপুরি গেরস্থ বনে গেছি। কাজ চাই। রেলদপ্তরে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু হাতের লেখার নমুনা দেখে রেলদপ্তর আর তাঁকে চাকরি করতে ডাকেনি। আমরাও একালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মনীষীকে পেয়ে গেলাম।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের জন্যে মার্কসের হজমশক্তি কমে যায়। তাই বেশি খেতে পারতেন না। খাবারের মধ্যে ভাঁপানো মাছ, শুয়োরের মাংসের রোস্ট, গোমাংস ভাজা, মাছের ডিম এবং আচার খেতে খুব ভালবাসতেন। পানীয় হিসাবে চলতো বিয়ার।

যতই অভাব অনটন থাক, মার্কসের বাড়ি বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের জন্য অবারিত থাকতো। যা জুটতো, সবাই ভাগ করে খেতেন। অনেক সময় একসঙ্গে বনভোজনও চলতো। হেলেনের ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি থাকতো না।

শেষদিকে মার্কসের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। সুখদুঃখের সঙ্গিনী জেনি মারা যান ২রা ডিসেম্বর ১৮৮১। এই শোক সামলাতে না-সামলাতেই মার্কস
পান—তাঁর বড়ো
বড়ো নাতিটির
ম বাজেনি। এর
খেলা করতেন।
াস। মার্কসের কাঁধ
সখানে নাতিটির
আর লিবক্‌নেখ্‌ট
ড়া (তখন ঘোড়ায়
চাবুক চালাতো।
তো। গতি কমলেই
ার-ও চলে গেল।
মার্কস গণিত চর্চা
াঁর বেশ অধিকার
ওপর তাঁর একটি

১৮৮৩, ১৪ই মার্চ মার্কসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর কালজয়ী রচনাবলী তাঁকে অমর করে রেখেছে।

(কার্ল মার্কস মৃত্যুশতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৩)

‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থের স্রষ্টা কার্ল মার্কস

অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

মানব সমাজের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের উৎপাদন ও বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলির বিজ্ঞান হল রাজনৈতিক অর্থনীতি। আর অর্থনীতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসীয় মতবাদের নাম মার্কসীয় অর্থনীতি। মার্কস তাঁর আগে ও সমকালে তিন ধরনের মতামত খণ্ডন করে নিজের চিন্তাভাবনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম দলে রয়েছেন অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, মর্সিয়া দা লা রিভেয়ার প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা। দ্বিতীয় দলে রয়েছেন রবার্ট ওয়েন, স্যাঁ সিমঁ, ফুরিয়ে প্রমুখ ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী। তৃতীয় দলটি হল মার্কসের ভাষায় মেকি অর্থনীতিবিদদের। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সমকালের বহু ছোটোবড় অর্থনীতিবিদ, যাঁদের ভূমিকা ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় নিঃশেষিত। মেকি অর্থনীতিবিদদের ছলচাতুরি উদ্ঘাটন করে, ক্ল্যাসিক্যাল দলের ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে এবং কল্পনাবিলাসীদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে মার্কস তাঁর অর্থনীতিবিজ্ঞানকে উত্তরকালের মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন। বেশিরভাগ
অর্থনীতিবিদই মানব … বিচার করতে ব্যর্থ হয়ে
একাকার করে ফেলে… প্রত্যেকটি সমাজব্যবস্থার
মধ্যে পার্থক্যগুলো… । দাসব্যবস্থা থেকে
সামন্ত-ব্যবস্থা, সামন্ত… নতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে
সমাজতন্ত্রের পার্থক্য … কীভাবে ঘটেছে বা ঘটবে
তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে… গর্ভে পুঁজিবাদের জন্ম,
পূর্ণবিকাশ এবং সম… ইতিবৃত্ত তিনি বর্ণনা
করেছেন। মার্কসের …

মার্কসীয় অর্থনী… গ্রন্থ রচনায় মার্কস তাঁর
কর্মময় জীবনের দীর্ঘ … ক তিনি অর্থনীতি-বিষয়ে
অনুসন্ধান করে আস… ছিল প্রাথমিক কাজ। এই
অনুসন্ধান ও পর্যা… য়ে উঠলেন তাই নয়,
আবিষ্কারকও হলেন … ষণার ফল ‘ক্যাপিটাল’
মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থ … আত্মত্যাগ তাঁকে করতে
হয়েছিল তার কোনে…

লন্ডনের প্রবাস-… র সময় কাটত প্রধানত
নিজের বাড়ির পাড়া… মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত
দেওয়ালে ঠাসা বই … উপচে পড়ছে। আসবাব
বলতে একটি চেয়ার … , কখনও কখনও গোটা
সপ্তাহ পড়ার টেবিল … ফাকে ফাকে ঘরের মধ্যে
পায়চারি করা ছিল তার অভ্যাস। এর ফলে মেঝেতে পা-চলতি একটা দাগ হয়ে গিয়েছিল। আর সাথী ছিল সস্তা দামের চুরুট। ধূমপানে অত্যধিক আসক্তি তাঁর শরীরের ক্ষতিও করেছিল। কিন্তু এ-ব্যাপারে ডাক্তারদের নিষেধ তিনি কোনোদিন মান্য করতে

মার্কসীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘ক্যাপিটাল’। ১৮৪৪ সাল থেকে তিনি অর্থনীতি-বিষয়ে অনুসন্ধান করে আসছিলেন। পুঁজিবাদের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করাই ছিল প্রাথমিক কাজ। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণার ফল ‘ক্যাপিটাল’ মহাগ্রন্থ।

পারেন নি। রসিকতা করে বলতেন—''ক্যাপিটাল' লিখতে গিয়ে যত চুরুট টেনেছি এই বই বিক্রি থেকে ততো টাকাও বোধকরি উঠবে না।''

'ক্যাপিটাল' রচনার প্রস্তুতি হিসেবে মার্কসকে পড়তে হয়েছিল পনেরশোরও বেশি বই। এইসব বই থেকে উদ্ধৃতি ও নোট নিতে গিয়ে পাহাড় জমা হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বই-এর পাশে পাশে মন্তব্য লেখা ও দাগ দেওয়া ছিল তাঁর পঠন-রীতি। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ, যে-কোনো বই হাতে নিতেই কোন পৃষ্ঠায় তাঁর প্রার্থিত বিষয়টি রয়েছে মুহূর্তের মধ্যে বের করতে পারতেন। বই সম্পর্কে তিনি বলতেন, ''ওরা হচ্ছে আমার দাসানুদাস, আমার ইচ্ছাপূরণ ওদের করতেই হবে।'' 'ক্যাপিটাল' রচনার কাজ যত এগিয়েছে তত দারিদ্র্য যেন তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। বন্ধকি দোকানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার মাঝখানে কোনো বড় কাজ করে ওঠা যে কত দুঃসাধ্য তা মার্কস অস্থিমজ্জায় অনুভব করেছিলেন। একবার খুবই বিরক্তির সঙ্গে এঙ্গেলসকে লিখলেন, ''পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আমার যদি যথেষ্ট অর্থ থাকত আর বইটা লেখা শেষ করতে পারতাম তাহলে আজ বা কাল একটা মড়ার মতো আমাকে ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও আমার, বিন্দুমাত্র দুঃখ করার থাকত না।'' ডা. কুগেলমানকে লিখিত চিঠিতে জেনি বলেছেন, ''বিশ্বাস করুন, এর থেকে দুঃসহ পরিস্থিতিতে আর কোনো বই বোধ করি লেখা হয়নি।'' জেনির সেবা এবং এঙ্গেলসের সহায়তা ও উৎসাহ একমাত্র ভরসা, যার উপর নির্ভর করে মার্কস এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে পারলেন।

১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে 'ক্যাপিটাল'-র প্রথম খণ্ড রচনার কাজ শেষ হল। বাড়িতে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল, যদিও উপকরণ কিছু নেই। তৎক্ষণাৎ জানান হল সুখবরটা এঙ্গেলসকে। এখন হামবুর্গে যেতে হবে পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশক মাইস্নার-এর কাছে। কিন্তু কী করে যাবেন? পোষাক, ঘড়ি সমস্ত কিছু বন্ধকি দোকানে বাঁধা পড়ে আছে। এঙ্গেলস টাকা পাঠালেন। সেই টাকায় বন্ধকি দোকান থেকে পোষাক ছাড়িয়ে, টিকিট সংগ্রহ করে যাত্রা করলেন পাণ্ডুলিপি নিয়ে। হামবুর্গে প্রকাশকের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে হানোভার-এ গেলেন বন্ধু ডাঃ কুগেলমানের সঙ্গে কয়েকদিন অতিবাহিত করার জন্য। তারপর লন্ডনে ফিরে এলেন মে মাসের মাঝামাঝি। ইতিমধ্যে ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। প্রুফ সংশোধন চলতে লাগল। এঙ্গেলসের সঙ্গে পরামর্শ করলেন বইয়ের পরিশিষ্টে কিছু সংযোজন করার ব্যাপারে। অবশেষে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি প্রুফ সংশোধনের কাজ শেষ হল। গ্রন্থাকারে 'ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল ১৮৬৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হামবুর্গে।

'ক্যাপিটাল' বিশ্বের সর্বকালের মহত্তম সৃষ্টিগুলির অন্যতম। এঙ্গেলস বলেছেন, ''শ্রমিকশ্রেণির প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ক্যাপিটাল'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।'' এই গ্রন্থটি প্রাথমিক পাঠের জন্য নয়। রাজনৈতিক অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আয়ত্ত না করে এই গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হলে দুর্বোধ্য মনে হবে। এর দুরূহতা সম্পর্কে মার্কস নিজেই সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছেন, ''বিজ্ঞানের পথ সহজ নয় এবং যাঁরা পর্বতশৃঙ্গে উঠবার চড়াই-এর কথা ভেবে অবসন্ন বা ভীত হয়ে পড়বেন না, তাঁরাই একমাত্র আলোকজ্জ্বল শীর্ষচূড়া দেখতে পাবেন।''[১] এই মহাগ্রন্থের চারটি খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ আজও প্রকাশিত হয়নি। বিপ্লবী আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এ একটা মস্ত অভাব।

''মার্কসবাদ কেবল সমাজবাদের তত্ত্ব নয়, মার্কসবাদ হলো বিশ্বদৃষ্টি। সেই বিশ্ব দৃষ্টি বা দার্শনিক পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এসেছে মার্কসের শ্রমিক-সমাজবাদ।''[২] এই বিশ্বদৃষ্টির মূল তত্ত্বই 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ—সমাজবাদের এক বিশ্বকোষ। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের দ্বিতীয় শিরোনাম 'এ ক্রিটিস অফ্ পলিটিকাল ইকনমি'। এই গ্রন্থকে লেনিন মার্কসবাদের গভীরতম, সর্বব্যাপী ও সম্যক প্রয়োগের অখণ্ডরূপ বলে অভিহিত করেছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের গতিপ্রকৃতির অর্থনৈতিক নিয়মাবলী অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও ধ্বংসের নিয়মাবলী এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য ঞ্জ

''মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজ-গঠনকে একটি জীবন্ত সত্তারূপে হাজির করেছেন। সেই সমাজ গঠনের বিশ্লেষণে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন এর দৈনন্দিন রূপ, পুঁজিবাদী সমাজ-সম্বন্ধের মধ্যে উদ্ভূত শ্রেণি-বিরোধের সামাজিক প্রকাশের বাস্তব রূপ এবং নগ্ন করে দেখিয়েছেন সেই বুর্জোয়া রাজনৈতিক বহির্গঠনগুলিকে (উপরিতলের রাষ্ট্র প্রভৃতি)—যে বহির্গঠন স্বাধীনতা, সমতা প্রভৃতি বুর্জোয়া ভাবধারা ও বুর্জোয়া পারিবারিক সম্বন্ধের সাহায্যে পুঁজিপতি-শ্রেণির প্রভুত্ব রক্ষা করে।''

বুর্জোয়া সমাজদেহের ব্যবচ্ছেদ করে তিনি তার সমস্ত রহস্যভেদ করে প্রথম তিনটি খণ্ডে সন্নিবেশিত করেছেন। প্রথম খণ্ডে রয়েছে পুঁজির উৎপাদনধারার বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে পুঁজির প্রচলনধারার বিশ্লেষণ এবং তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বিশ্লেষণ। চতুর্থ খণ্ডে আলোচিত হয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। মার্কস অর্থনৈতিক আলোচনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে সাজিয়ে এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর দ্বারা বহু মৌলিক অর্থনৈতিক তত্ত্বমূলক সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছেন।

গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা ও দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের তৎকালে লভ্য সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে চুলচেরা ব্যাখ্যা করে তার অসারতা প্রমাণ করে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুঁজি ও শ্রমের সম্পর্ক, পুঁজিপতি শ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদে শ্রেণিসংগ্রামের গতিমুখ সর্বদাই ধাবিত হবে পুঁজিবাদী শ্রেণির বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের বিজয়ের অভিমুখে।

দুই

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কসের মহৎ অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম 'মূল্যের

শ্রমতত্ত্ব'-এর সূত্রায়ন। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ইতিপূর্বে শ্রমতত্ত্বটি উদ্ভাবন করেন। তিনি বলেছিলেন, শ্রমিকের কায়িক শ্রমই একমাত্র সৃজনীশক্তি এবং এই শ্রমদ্বারাই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি এই তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করতে পারেননি। মার্কসই প্রথম 'মূল্যের শ্রমতত্ত্ব'কে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দেন। তাঁর শ্রমতত্ত্ব অনুযায়ী পণ্যের মধ্যে নিহিত সামাজিক শ্রমের (Socially necessary labour) দ্বারাই পণ্যের মূল্য স্থিরীকৃত হয়। নির্ধারিত মজুরিতে শ্রমিক তার শ্রমশক্তি (labour power) মালিক বা পুঁজিপতির কাছে বিক্রি করে। শ্রমিকের এই শ্রমশক্তিই কলকারখানায় যত্রপাতি ও অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে পণ্যে রূপান্তরিত হয়। একটি পণ্য উৎপাদনে যতখানি সময় আবশ্যক হয় সেই সময় নিয়েই পণ্যের মধ্যেকার শ্রমের পরিমাণ স্থির করা হয়। বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তার অন্তর্নিহিত মূল্য প্রকাশিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে মুদ্রাই সকল পণ্যের মূল্যের সর্বসম্মত রূপ।

পুঁজিপতিরা তাদের পণ্য বাজারে নিয়ে গিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত শ্রম বা মূল্যকে মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করে অর্থাৎ বিক্রি করে মুদ্রায় পরিণত করে। এর থেকে তারা লাভ করে মুদ্রার আকারে উদ্বৃত্ত মূল্য। সেই উদ্বৃত্ত মূল্যকে খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসেবে ভাগ করে জমিদার, ব্যাঙ্ক মালিক ও শিল্পপতি নিজ নিজ ভাগ বুঝে নেয়। অতএব শ্রমিক তার শ্রমের দ্বারা যে মূল্য সৃষ্টি করে তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ মজুরি হিসেবে পায়, বাকি বৃহদংশ অন্যান্য বিভিন্ন নামের মূলধনীরা ভাগ করে নেয়। মার্কস তাঁর গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, শ্রমিককে বঞ্চিত করা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যেই পুঁজিপতিরা কলকারখানায় পণ্য উৎপাদন করে, আর একেই বলে 'পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিক শোষণ'। শোষণই হল পুঁজিবাদী সমাজের মূল ভিত্তি। এটাই হল মার্কসের মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সারকথা।

ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণের মূল ভিত্তি হল উদ্বৃত্ত-মূল্য। ক্যাপিটাল মহাগ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডটি সম্পূর্ণই তিনি নিয়োজিত করেছেন এই 'উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব' বিশ্লেষণে।

মার্কস বলেছেন, ''উদ্বৃত্ত মূল্য হল বুর্জোয়া সমাজের নিষ্কর্মা ও অলসদের আয়।'' তিনি পুঁজিকে রক্তচোষা বাদুড়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন এই রক্তচোষা 'বাদুড়' বেঁচে থাকে জীবন্ত শ্রমকে (অর্থাৎ শ্রমিককে) শোষণ করে, আর যতো বেশি সে বাঁচে তত বেশি করে সে জীবন্ত শ্রমের শোষণ তীব্র করে। অথচ এই শোষণ-ক্রিয়াটাই এতকাল পুঁজিবাদীদের অর্থভুক অর্থনীতিবিদরা আড়াল করে এসেছেন নানা তাত্ত্বিক বাতাবরণে। তাঁরা শ্রমিকের মজুরির ব্যাপারটা এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যেন শ্রমিক প্রতিদিন যত উৎপাদন করে তার পূর্ণ মূল্যই সে পেয়ে থাকে। মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বুর্জোয়াদের এই কারচুপিকে ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজের মজুরি-প্রথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে শ্রমিক-শোষণের সমগ্র কৌশলটি। যেমন, একজন শ্রমিক কোনো কারখানায় আট ঘণ্টা কাজ করে ১০০ টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন করে। এই আট ঘন্টার মধ্যে দু-ঘণ্টার শ্রম দ্বারা সে একদিনের পূর্ণ মজুরির (মালিক তাকে যা দেয়) সমান মূল্য উৎপাদন করে। অর্থাৎ সেই শ্রমিক তার আট ঘণ্টা শ্রমের মধ্যে দু-ঘন্টার শ্রমের দাম ২৫ টাকা মজুরি হিসেবে পায়, বাকি ছ-ঘণ্টার শ্রমের দাম-বাবদ সে এক পয়সাও পায় না। এই ছ-ঘণ্টার শ্রমের মূল্য-বাবদ ৭৫ টাকা মালিকরা উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসেবে আত্মসাৎ করে। শ্রমিকের দু-ঘণ্টার শ্রম হলো মার্কসের ভাষায় ক্রীতশ্রম (Paid labour) আর বাকি ছয় ঘণ্টার শ্রম অক্রীত শ্রম (Unpaid labour)।

লেনিন তাই উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্বকেই মার্কসীয় অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভরূপে অভিহিত করেছেন। এই তত্ত্বই আমাদের দেখিয়েছে, কীভাবে মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ এবং শ্রমশক্তির কেনা-বেচার মাধ্যমে কলকারখানা, জমি ইত্যাদির কতিপয় মালিক কোটি কোটি শ্রমিককে অমানবিক শোষণ ও মজুরি-দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ করেছে। পুঁজিবাদের বিকাশ-ধারার বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখিয়েছেন ধনতন্ত্র কীভাবে পুঁজির পুঞ্জীভবন করে ক্ষুদ্র শিল্পকে ক্রমশ গ্রাস করে বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ধনতন্ত্রের সর্বাধিক বিকাশের ফলেই বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠছে এবং বুর্জোয়া-শ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ক্রমশ চরম রূপ ধারণ করছে।

মার্কস আরও প্রমাণ করেছেন যে উদ্বৃত্তমূল্য বেশিমাত্রায় আত্মসাৎ করার জন্যই বুর্জোয়ারা নতুন নতুন যন্ত্রের প্রবর্তন করে উৎপাদন-ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যন্ত্রের দ্বারাই পুঁজি শ্রমিকশ্রেণিকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। মার্কস দেখিয়েছেন, পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিক-শোষণের উদ্দেশ্যে যন্ত্রের এই ব্যবহারের ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার অবসান হবে অনিবার্যভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনে আর সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অসংখ্য ঐতিহাসিক তথ্য ও যুক্তির সমাবেশ। শিল্পোন্নত গ্রেট ব্রিটেনের পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ-প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে অজস্র দৃষ্টান্তের সাহায্যে মার্কস দেখিয়েছেন শ্রমিক আর শ্রমজীবী জনসাধারণের রক্ত শুষে ও অস্থিমজ্জা চর্বণ করেই পুঁজিবাদের শ্রীবৃদ্ধি। তাই মার্কসের ভাষায়, ''পুঁজির মাথা দিয়ে পা দিয়ে এবং প্রত্যেকটি রন্ধ্র দিয়েই ঝরে পড়ছে বিন্দু বিন্দু রক্ত, নিষ্কাষিত হচ্ছে অসহ্য পুতিগন্ধ।''[৩] উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করার অতিরিক্ত লোভ থেকে বুর্জোয়া অর্থনীতির সংকটও দেখা দেয়। পণ্যোৎপাদনের সামাজিক রূপের সঙ্গে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মুনাফার দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই পণ্যোৎপাদনে অরাজকতা দেখা দেয়। ক্রমশ অধিক পরিমাণ পুঁজি শিল্পে নিয়োজিত হয়ে উৎপাদন-শক্তিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি করে এবং এর দ্বারা যন্ত্রপাতি ও শিল্পকৌশলের দ্রুত উন্নতি হয়। অপরদিকে শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। মোট মজুরির পরিমাণও

কমে যায়। মোট মজুরির পরিমাণ অর্থাৎ সমাজের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত মুনাফার আশায় পুঁজিপতিরা জিনিসের মূল্যও বৃদ্ধি করে। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেলে, জিনিসের মুল্য বৃদ্ধি পেলে, বাজারে জিনিস অবিক্রীত থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয়।

এই সংকট বিশ্লেষণ করে মার্কস বলেছেন, শ্রমিকরা নিজেদের শ্রম দিয়ে যে পণ্য উৎপাদন করে তা ক্রয় করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। সুতরাং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই এই সংকটের চেহারা প্রকট করে তোলে। আর এই দ্বন্দ্ব নিরসন করার কোনো কৌশল পুঁজিপতিদের জানা নেই। কৃষিতে ধনতান্ত্রিক শোষণের গতি-প্রকৃতির চিত্রটিও তিনি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মুক্তির পথও নির্দেশ করেছেন।

পুঁজির একীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ (Concentration and Centralisation) হওয়ার ফলে বিকশিত পুঁজিবাদী সমাজে কিভাবে চরম সংকট দেখা দেয় এবং শ্রমজীবী জনগণের দারিদ্র্য ও দুঃখ কিরূপে সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায় তার চিত্র মার্কস নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই চরম পরিণতি সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

''পুঁজির বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীর ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তির (অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টির) সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় ব্যাপক দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দশা, অত্যাচার, উৎপীড়ন, দাসত্ব, অধঃপতন ও শোষণ; আর অপর দিকে বেড়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণির বিদ্রোহ-বিপ্লব। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদনধারার মধ্য দিয়েই দ্রুত বৃদ্ধি পায় শ্রমিকশ্রেণির সংখ্যা; তারা হয়ে ওঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত। পুঁজির যে একচেটিয়া অবস্থা পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়ে বেড়ে ওঠে, পুঁজির সেই একচেটিয়া অবস্থাই সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার সামনে অনতিক্রমনীয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের কেন্দ্রীভূত অবস্থা আর শ্রমের সামাজিক রূপ শেষে এমন একটা সীমায় এসে পৌঁছয় যেখানে ঐগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার খোলসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। তখনই এই খোলস ফেটে যায় টুকরো টুকরো হয়ে, পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে, শুরু হয় বঞ্চনাকারীদের বঞ্চিত হওয়ার পালা।"

পুঁজিবাদী সমাজের অবসানে নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রূপরেখাও মার্কস অঙ্কিত করেছেন তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে। ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা, সুপরিকল্পিত বন্টন, সমাজিক শ্রমের ভিত্তিতে দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন, উৎপাদনের সকল শাখার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান, উৎপাদনশক্তিগুলির যুক্তিসম্মত সমাজভিত্তিক ব্যবহার, শ্রমজীবী জনসাধারণের সৃজনীশক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক, সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস বলেছেন, ''যখন উৎপাদন হবে সমাজের সচেতন ও সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, কেবল তখনই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যবহৃত সামাজিক শ্রম-সময়ের পরিমাণ এবং সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য সামাজিক চাহিদার সমতা।"[৫] সমাজতান্ত্রিক সমাজে উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র সমাজের সম্পত্তি হয়ে উঠবে এবং শ্রমজীবী জনগণের জীবনের মান বিকশিত করবে।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের বৈপ্লবিক শিক্ষার মর্মোদ্ধার করে লেনিন বলেছেন, ''একথা বলা যায়, মার্কসের সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিতে এই সত্যই উচ্চস্থান পেয়েছে যে, পুঁজিবাদী সমাজের মূল শক্তি মাত্র দুটি—পুঁজিপতিশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণি। পুঁজিপতিশ্রেণি হলো পুঁজিবাদী সমাজের স্রষ্টা, তার পরিচালক; আর শ্রমিকশ্রেণি হলো পুঁজিপতিশ্রেণি ও পুঁজিবাদী-সমাজের কবর-খননকারী এবং একমাত্র শক্তি যা পুঁজিপতিশ্রেণির স্থান দখল করতে পারে।"[৬]

মার্কস যখন 'ক্যাপিটাল' রচনা করেছিলেন তখন ছিল পুঁজিবাদের বিকাশের যুগ। এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত তত্ত্বের আলোকে লেনিন তাঁর সমকালে পুঁজিবাদের আরেকটি স্তর প্রত্যক্ষ করেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, প্রত্যেক দেশেই পুঁজিবাদী বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়, সমাজের উপর একচেটিয়া পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম হয়। পুঁজিবাদের একচেটিয়া রূপগ্রহণ ও সাম্রাজ্যবাদের রূপান্তরের নিয়মটিই লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ—পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' গ্রন্থে সূত্রবদ্ধ করেন। সাম্রাজ্যবাদ পতনোন্মুখ পুঁজিবাদ। এখান থেকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগের সূচনা হয়েছে বাস্তব ক্ষেত্রে।

শ্রমিকশ্রেণির বৈপ্লবিক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মহা-অস্ত্রভাণ্ডার মার্কসের এই 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ। এর মধ্যেই স্তরে স্তরে সাজান আছে পুঁজিপতিদের সমস্ত অস্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য পাল্টা অস্ত্রসমূহ। এই অস্ত্রগুলিকেই শাণিত করে ব্যবহার করেছেন লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুঙ, হো-চি-মিন প্রমুখ বিপ্লবীরা, এবং বিজয়ীও হয়েছেন। তাই আজও 'ক্যাপিটাল'-এর প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রতিটি শিক্ষা সমানভাবে সত্য ও কার্যকরী। তথাকথিত মার্কসীয় গবেষক, ছদ্ম মার্কসবাদী, সংশোধনবাদী ও সংকীর্ণতাবাদীদের দূষণ-প্রয়াস থেকে মুক্ত রেখে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের মধ্যে বিধৃত মার্কসের শিক্ষাগুলির অনুশীলনের মধ্যেই আজ বিশ্বের সমস্ত দেশ ও জাতির সুস্থ ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

তিন

প্রথম খণ্ড প্রকাশের আগেই মার্কস মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড রচনার কাজ শেষ করে রেখেছিলেন। কিন্তু ছাপাখানায় পাঠাবার উপযোগী করে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস এই কাজ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। মার্কসের দুর্বোধ্য হাতের লেখা পাঠ করা যেমন অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, তেমনি এই গ্রন্থের গভীরতার পরিমাপ করা এঙ্গেলস ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' খণ্ডটি বিংশ

শতাব্দীর প্রথম দশকে কাউটস্কির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলি নীরবতার নীতি গ্রহণ করে চললো। ফলে মার্কসকে উদ্যোগ নিতে হলো যাতে এই গ্রন্থের মূল বিষয়গুলি প্রচার হয়। এঙ্গেলস ও ডাঃ কুগেলমান বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের পত্র-পত্রিকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যোহান ফিলিপ বেকার তাঁর 'ডেয়ার ফোরবোটে' পত্রিকায় গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার করলেন। লিবনেখ্‌ট 'ডোমোক্রাটিশেষ ভোখেনব্লাট' পত্রিকায় নিয়মিত ক্যাপিটালের অংশবিশেষ প্রকাশ করতে লাগলেন। মার্কসের অনুগামীরা সর্বত্র শ্রমিকদের মধ্যে এই গ্রন্থের বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন সভাসমাবেশে বক্তৃতা দিতে লাগলেন নিয়মিতভাবে। ১৮৭১ সালের মধ্যেই ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের প্রথম জার্মান সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেল। প্রকাশক মাইস্নার দ্রুত দ্বিতীয় সংস্করণের পরিমার্জনার কাজ সমাপ্ত করতে মার্কসকে অনুরোধ করলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে মার্কস ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করলেন। প্রথম সংস্করণের ছটি পরিচ্ছেদের বদলে দ্বিতীয় সংস্করণে সাতটি অধ্যায় ও পঁচিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করলেন সমগ্র গ্রন্থটি। অবশেষে ১৮৭৩ সালে প্রথম সংস্করণের প্রায় তিনগুণ আকার নিয়ে এবং একটি উপসংহার পরিচ্ছেদ যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হয়।

প্রথম জার্মান সংস্করণটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই রুশভাষায় অনুবাদের প্রস্তাব আসে সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে। অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন হারমান লোপাটিন নামে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। লোপাটিন ১৮৭০ সালে লন্ডনে আসেন মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। অল্পদিনের আলাপেই পঁচিশ বৎসর বয়স্ক এই যুবকের সঙ্গে মার্কসের বেশ গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এই যুবকের বুদ্ধিমত্তা-জ্ঞানৈষণা মার্কসকে মুগ্ধ করে। বিপ্লবী চের্নিশেভস্কির শিষ্য লোপাটিনের চোখে মার্কস ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ। মার্কসের পরামর্শ ও আলোচনাক্রমে লোপাটিন প্রথম খণ্ড অনুবাদের কাজ শুরু করেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। সেই সময় সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে চের্নিশেভস্কিকে মুক্ত করতে গিয়ে লোপাটিন নিজেই গ্রেপ্তার হয়ে যান এবং ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত বন্দি থাকেন। অনুবাদের কাজ শেষ করেন লোপাটিনের বন্ধু নিকোলাই দানিয়েলসন ও নিকোলাই লুবাভিন। অবশেষে ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে তিন হাজার কপি প্রথম রুশ সংস্করণ প্রকাশিত হলো এবং এক বছরের মধ্যেই নিঃশেষ করে গেল। যদিও জারের সেন্সর-অফিসার প্রকাশের ছাড়পত্র দিয়েছিল এই ভরসায় যে ''রাশিয়ায় সামান্য কয়েকজন এই বই পড়বে এবং বুঝবে হয় তো এক-আধজন।'' কিন্তু অন্য যে-কোনো দেশ অপেক্ষা রাশিয়ায় এই বই বেশি সমাদৃত হয়েছিল এবং বহু মার্কসবাদী পাঠচক্র ও কেন্দ্র দ্রুত গড়ে উঠেছিল। এটাই ছিল প্রথম বিদেশি সংস্করণ। প্রকাশের দিন মার্কসের পরিবারে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিদেশি ভাষায় 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হয় ফরাসিতে। মার্কসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুবাদের কাজ হয়। ১৮৭২ ও ১৮৭৫ সালে দুটি ভাগে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ফরাসি দেশের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ প্যারি কমিউনের পরাজয় ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কমিউনের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল কমিউনের বেশিরভাগ সদস্যের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব এবং প্রুধোঁবাদের ব্যাপক প্রভাব। এ-কারণেই মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এর ফরাসি অনুবাদ প্রকাশে বেশি আগ্রহী ছিলেন। লুডভিগ বুশনারকে এক পত্রে মার্কস লেখেন, ''আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থ ফরাসিদের ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে, যে ভ্রান্ত ব্যবস্থার মধ্যে তাদের প্রুঁধো তাঁর পেটিবুর্জোয়া আদর্শবাদ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।'' তাছাড়া বেজলিয়াম, স্পেন ও ইতালিতে ফরাসি ভাষা বেশি মানুষের মধ্য প্রচলিত ছিল। 'ক্যাপিটাল' ফরাসি ভাষায় অনূদিত হলে এইসব দেশের নৈরাজ্যবাদী রাজনীতিবিদদের প্রভাব থেকে শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্ত করা সহজ হবে। ফরাসি সংস্করণের অনুবাদ করেন যোসেফ রয়। যদিও রয় একজন যোগ্য অনুবাদক ছিলেন কিন্তু তাঁর এই অনুবাদ মার্কসকে খুশি করতে পারেনি। তিনি নিজে ফরাসি ভাষা ভালই জানতেন, তাই অনুবাদ আদ্যন্ত পরিমার্জনা করলেন। ফলে গ্রন্থের আকার বেড়ে গেল। মোট আটটি অধ্যায় ও তেত্রিশটি পরিচ্ছেদে ফরাসি সংস্করণ প্রকাশিত হল। এতে তিনি একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করেন। এই সংস্করণটি মূল জার্মান সংস্করণের চেয়েও মার্কসের কাছে বেশি প্রিয় ছিল। পরবর্তী কালে অন্যান্য ভাষার অনুবাদকদের তিনি এই ফরাসি সংস্করণ অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি জার্মান পাঠকদেরও তিনি এই সংস্করণটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে অনুরোধ করতেন। আজ বিশ্বে এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে 'ক্যাপিটাল'-এর অনুবাদ হয়নি এবং কোটি কোটি মানুষ পাঠ করেননি।

এঙ্গেলস বলেছেন, ''শ্রমিকশ্রেণির প্রয়োজনীয় গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে 'ক্যাপিটাল'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।'' কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠ করে সরাসরি আত্মস্থ করা যে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, মার্কস নিজেই তা বলেছেন। তাই এই গ্রন্থপাঠের আগে মার্কসের দুটি পুস্তিকা, 'শ্রমশক্তি ও মূলধন' এবং 'মূল্য, দর ও মুনাফা' পড়া কর্তব্য। এছাড়া এঙ্গেলস-এর 'ক্যাপিটাল প্রসঙ্গে' এবং 'সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক' গ্রন্থদুটির পাঠ সহায়ক হবে। মার্কসীয় অর্থনীতির এই মহামূল্যবান গ্রন্থটির অধ্যয়ন শ্রমিক-বিপ্লবের মহা হাতিয়ার। তাই এর চর্চা গুরুত্ব-সহকারে হওয়া প্রয়োজন। নাহলে বুর্জোয়া অর্থনীতির ছলচাতুরি ধরতে পারা যাবে না এবং বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করা যাবে না।

তথ্যসূত্র

১. *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১
২. *জে.ভি. স্তালিন—গ্রন্থাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৭
৩. *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৬৪
৪. *ক্যাপিটাল*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৬৬
৫. *ক্যাপিটাল*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫
৬. *লেনিন—সংগৃহীত রচনাবলী*, খণ্ড ২৪, পৃ. ১৫৯

কার্ল মার্কসের ‘পুঁজি’ গ্রন্থ, মার্কসবাদ ও ভারত

হরিহর ভট্টাচার্য

> মার্কস তাঁর ‘পুঁজি’ গ্রন্থ কোনো অ্যাকাডেমিক তাত্ত্বিক কারণে রচনা করেননি। এই গ্রন্থ রচনার আসল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক, অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের হাতে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দেওয়া।

ভূমিকা

কার্ল মার্কসের (১৮১৮-৮৩) ‘পুঁজি’ (Capital)[১] গ্রন্থের প্রথম ভ্যলুম প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। এই প্রকাশের ঠিক পঞ্চাশ বছরের মাথায় ১৯১৭ সালে পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়। অনেকে হয়তো অবাক হবেন যে, যে দেশের বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মার্কস তেমন গুরুত্বই দেন নি, বিপ্লব ঠিক সেখানে হল। অ্যান্তোনিও গ্রামসি ১৯১৭ সালে এক ছোটো প্রবন্ধে, যার শিরোনামটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ (Revolution Against ‘Das Capital’)[২], ওই বিপ্লবকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েও এই মত প্রকাশ করেন যে, ওই বিপ্লব মার্কসের নির্দেশিত পথে হয়নি। কিন্তু রাশিয়ান বিপ্লবের যারা নিখুঁতভাবে চর্চা করেছেন, তাঁরা জানবেন যে, সে দেশে বিপ্লবের প্রাক্ মুহূর্তে কার্ল মার্কসের ‘পুঁজি’ গ্রন্থের (রাশিয়ান অনুবাদ) হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার, কার্ল মার্কসের বিপ্লবের কোনো ‘নির্দেশিত পথ’ ছিল না বা সম্ভব নয়। মার্কসবাদে কয়েকটি সাধারণ নীতি মাথায় রেখে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ নিজ দেশে কমিউনিস্ট দল ... রতে হবে—এটাই ছিল মার্কসের ‘নির্দেশিত ...

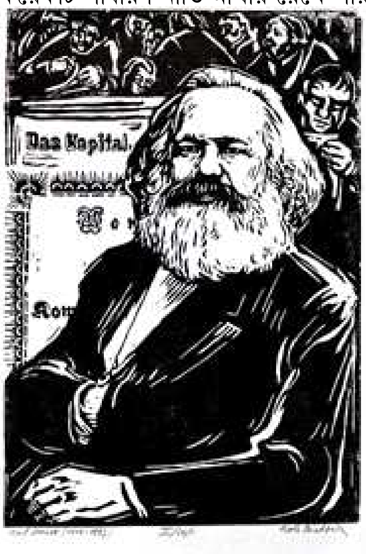

পুঁজি গ্রন্থ কেন কাল ...

মার্কসের ‘পুঁজি’ ... বাদ, তথা তাঁর এই গ্রন্থ সারা বিশ্বে আলোচন ... না মতবাদ ও তত্ত্ব এই মর্যাদা লাভ করেনি। ... রেও মার্কসের লেখায় আগ্রহ কোনো অং ... পাশ্চাত্যের নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ... ন পুঁজিবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তাকে ... নি। পুঁজিবাদের ‘সংকট তত্ত্ব’ মার্কসের মৌলি ... রছে। আমাদের বিশ্বে ‘মন্দা’-র ধারাবাহিক ... চলিত ‘অধুনা-প্রাক্তন’ তথাকথিত সমাজতা ... মুখী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ওইসব ব্যবস্থ ... যায়। ওইসব ব্যবস্থার অবসানের পর আরও মুক্ত মনে মূল মার্কসের রচনা পাঠ সহজতর হয়েছে। অবশ্য সোভিয়েত বিপ্লবের পর, বিশেষ করে ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর যে ব্যবস্থা সোভিয়েত ইউনিয়নে কয়েম হয়, তার মার্কসীয় সমালোচনার এক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে।[৪] যদিও সে চর্চারও অনেক সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে, তার অন্তর্নিহিত সংকট থাকবে, এবং মার্কসের মতবাদ ও তত্ত্বের, বিশেষ করে তাঁর ‘পুঁজি’ গ্রন্থের, প্রাসঙ্গিকতাও থাকবে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

প্রখ্যাত মার্কস গবেষকরা এটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে মার্কসের ‘পুঁজি’ গ্রন্থেই প্রথম

মার্কসবাদের একটি সম্পূর্ণ ও সমন্বিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। আলতুসার তাঁর গ্রন্থ 'Fore Marx' (১৯৬৫) ও পরে বালিবারের সঙ্গে যৌথ বই 'Reading Capital' (১৯৬৮) এটা প্রমাণ করে যে 'পুঁজি' গ্রন্থেই এক পরিণত মার্কস তাঁর আগের লেখার নানা মতাদর্শগত দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে উঠে এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটান—যেটি হচ্ছে পুঁজিবাদের উদ্ভব, বিকাশ, চরিত্র এবং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি তাত্ত্বিক ও সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতিফলন। এক কথায়, যাকে সাধারণভাবে 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' বলা হয়ে থাকে তার সন্ধান মেলে এই পুঁজি গ্রন্থেই। মার্কসের আগের লেখায় এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উপাদান পাওয়া যায়, কিন্তু তার সামগ্রিক রূপটি নয়।

এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উপাদানগুলি হল ঃ এক, পুঁজিবাদ একটি সামগ্রিক আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা এবং একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এরা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত। দুই, পুঁজিবাদ একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা যা চলতে থাকে পুঁজিবাদের কয়েকটি অমোঘ নিয়মে—যোগান-চাহিদা, উৎপাদন-বন্টন, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে। তিন, পুঁজিবাদ একটি পণ্য উৎপাদনকারী অর্থ-ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে, পুঁজিবাদীরা উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ করেন এবং হস্তগত করেন—যেটি পুঁজিবাদের প্রাণভোমরা। পুঁজিপতিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে এই উদ্বৃত্ত মূল্য নিষ্কাশন হতে থাকে, কেননা তাছাড়া পুঁজিবাদ টিকে থাকবে না। পুঁজিপতিদের নিরন্তর এই প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে, উদ্বৃত্ত মূল্য পুনরায় খাটাতে হবে, যা আরও বেশি মুনাফা এনে দেবে। পুঁজিবাদ তাই অন্তহীন ভাবে পুঁজির পুনরুৎপাদন করে যাবে, না হলে তাদের কলকারখানা বা কোম্পানি বন্ধ করে দিতে হবে। চার, পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী সংকট পুঁজিবাদের মধ্যেই নিহিত। পুঁজিবাদই সর্বপ্রথম দেশের আপামর জনসাধারণকে (শ্রমজীবীদের) তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে, যার মাধ্যমে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া এক সামাজিক ও গণচরিত্র (public) অর্জন করে। অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদনের লাভ যায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের পকেটে। এটাকে বলা হয়, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ফসলের ব্যক্তিগত দখল (Private appropriation)। একদিকে দারিদ্র, অনাহার এবং অতি সাধারণ দিনগত পাপক্ষয়, অন্যদিকে মুষ্টিমেয়র হাতে প্রভূত সম্পদ ও সীমাহীন বিলাসব্যসন এবং অপচয়। এই দুই-এর দ্বন্দ্বের নিরসন পুঁজিবাদের মধ্যে সম্ভব নয়। সাধারণ শ্রমজীবীরা এক বঞ্চিত, শোষিতের জীবন যাপন করে, দাবি করে বেশি মজুরি, বেশি নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক মানবিক জীবন—পুঁজিবাদ তা দিতে পারবে না। উৎপাদনের এই গণচরিত্রই ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রের ভিত তৈরি করে দেয়। এক অস্থির, দ্বন্দ্বসমৃদ্ধ পুঁজিবাদ মুক্তিলাভ করে। আপামর জনসাধারণের উৎপাদন প্রক্রিয়া তথা নিয়ন্ত্রণের রাশ হাতে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, পুঁজিবাদের অবসানের মধ্যে।

'পুঁজি' গ্রন্থের রাজনৈতিক পাঠ

বলাই বাহুল্য, মার্কস তাঁর 'পুঁজি' গ্রন্থ কোনো অ্যাকাডেমিক তাত্ত্বিক কারণে রচনা করেননি। এই গ্রন্থ রচনার আসল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক, অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের হাতে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার তুলে দেওয়া। এই গ্রন্থপাঠে দেখা যায়, মার্কস তিনটি স্তরে পুঁজিবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত, ইংল্যান্ডকে একটা মডেল ধরে নিয়ে পণ্য উৎপাদনকারী এই ব্যবস্থার এক বিমূর্ত তাত্ত্বিক আলোচনা। দ্বিতীয়ত, বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় কীভাবে এই পুঁজিবাদের এবং তার দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা বিশ্লেষণ করা। তৃতীয়ত, শ্রমজীবী মানুষকে ক্ষমতাশালী করা। তাদের বুঝতে সাহায্য করা যে তারা এই পুঁজিবাদকে অধিকার করে সমগ্র অর্থব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে সক্ষম। ১৮৭২ সালে এক ফরাসি সংস্করণের মুখবন্ধে মার্কস লিখেছেন যে তাঁর এই পুস্তক রচনায় শ্রমিকশ্রেণি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঃ 'a consideration which to me outweighs everything else.'[৬] শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উপরিউক্ত দ্বিতীয় স্তরটি সবচেয়ে বেশি বিবেচ্য কেননা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর্থ-সামাজিক স্তরে। এ প্রসঙ্গে লুকাসের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ''প্রাচীন গ্রিসে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার দ্বন্দ্বের মধ্যে সে যুগের শ্রেণিদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।''[৬] পুঁজিবাদে শ্রমজীবীদের কর্মহীনতা এবং নিত্তনৈমিত্তিক কর্মচ্যুতি পুঁজির ভিতরের দ্বন্দ্বের আর্থিক তথা সামাজিক বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্র যেহেতু এই পুঁজিবাদের এক রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, রাষ্ট্রক্ষমতা তাই শ্রেণিসংগ্রামের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস তাঁর 'পুঁজি' (১৮৬৭) গ্রন্থে দেখিয়েছেন ঃ শ্রমিকের 'সাধারণ' কর্মসময়ের পিছনে ছিল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকের বহু সংগ্রামের ফল; আধুনিক শ্রম আইন শ্রমিকের কাজের সময় কমিয়ে দিয়েছে, তথাপি শ্রমিককে তার শ্রমশক্তির সবটুকুই পুঁজিপণ্য উৎপাদনে দিয়ে দিতে হয়। শ্রমিক শেষে নিঃশেষিত হয়ে যায়। মার্কসের এই গ্রন্থে পুঁজির পুনরুৎপাদনে রাষ্ট্রীয় আইন এবং নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তথাকথিত 'জাতীয় সম্পদ' (মনে রাখতে হবে অ্যাডাম স্মিথ-এর বিখ্যাত বই 'The Wealth of Nations' ইত্যাদির কথা) হল পুঁজির গঠন এবং আপামর জনসাধারণের নগ্ন শোষণ এবং তাদের জীবনে দারিদ্রকে নিত্যসঙ্গী করা—এই প্রক্রিয়াটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তার চূড়ান্ত স্থানে পৌঁছে যায়।[৭]

পুঁজি, পণ্য ও শোষণ

মার্কস পুঁজিবাদকে পণ্য উৎপাদনকারী এক অর্থব্যবস্থা বলেছেন। পণ্য কীভাবে তৈরি হয়? এ ব্যাপারে মার্কসের একটি সুন্দর উপমা আছে—পৃথিবী হল মা এবং শ্রম হল বাবা। প্রকৃতির ওপর মানুষের শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে যে ফল লাভ হয় তা হল পণ্য। মানুষ অন্তহীনভাবে তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে। বিক্রি করে। যে পণ্য এর ফলে তৈরি হয়, তার ওপর শ্রমিকের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—এটা পুঁজিপতির সম্পদ। শ্রমিক তার শ্রমশক্তির একটা দাম পায় মাত্র, যাকে মজুরি বলা

হয়। কিন্তু এই ‘মজুরি’ তার পুরো শ্রমশক্তির দাম নয়—বরং শ্রমিক হিসেবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ন্যূনতম এক মূল্য তাকে ধরে দেওয়া হয় মাত্র, এটাকে মার্কস বলেছেন—‘Socially necessary labour time spent...’ ধরা যায়, শ্রমিক একমাস কাজ করে যা পায় সেটা তার ১৫ বা ২০ দিনের কাজের মূল্য। বাকি ১৫ বা ১০ দিনের মূল্য যেটা শ্রমিককে দেওয়া হয় না, সেটা উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus value), যা পুঁজিবাদের মুনাফা (Profit)। যদি শ্রমশক্তির পুরো মূল্য শ্রমিককে দেওয়া হয়, তাহলে পুঁজির পুনরোৎপাদন সম্ভব নয়। কেননা, ওই উদ্বৃত্ত মূল্য পুনরায় খাটানো যায় এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য। শেষ বিচারে পুঁজি কিন্তু একটি সম্পর্ক—আমি পুঁজিবাদী বলার অর্থ হল উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে আমার এক বিশেষ সম্পর্ক আছে; আমি তার মালিক, তাই উৎপাদিত পণ্যের উপরও মালিকানা আমার। পুঁজিবাদের অবসান শেষ বিচারে এই সম্পর্কেরই মৌল পরিবর্তন ঘটাবে। কাজটা কঠিন, কারণ এই সম্পর্কের সামাজিক সাংস্কৃতিক মোড়ক তৈরি হয়ে যায়, এর পক্ষে তৈরি হয় সুবিস্তৃত নৈতিক পরিমণ্ডলও। গ্রামশি এর নাম দিয়েছেন ঃ ‘Moral injunctions.’[৮]

মার্কসের ‘পুঁজি’ গ্রন্থ ও ভারত

ভারত সম্পর্কে মার্কসের বরাবর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ১৮৫৩ সাল থেকে ‘New York Daily Tribune’ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে তিনি ‘ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ’ বলে আখ্যা দেন।[৯] কিন্তু তাঁর ‘পুঁজি’ গ্রন্থে ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ওপর তাঁর বিশ্লেষণ ছিল তীক্ষ্ণ। ‘পুঁজি’ গ্রন্থের ৩১নং অধ্যায়ে ‘শিল্প পুঁজির উৎস’ শিরোনামে উপনিবেশবাদ ভারতে যে তাণ্ডব চালিয়েছিল এবং লুটপাট, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চূড়ান্ত দুর্নীতি ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এক সময়কার ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিচার প্রক্রিয়ার প্রতি সুনির্দিষ্ট আগ্রহ থেকে তিনি দেখালেন কীভাবে এক বর্বর, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা ভারতের সম্পদ লুঠ করে। তিনি এক অসাধারণ উদাহরণ দিয়েছেন ঃ কোনো Sullivan (কোম্পানি অফিসার) ভারতে আসার পথে যখন ইংল্যান্ড ছাড়লেন তাঁকে আফিং-এর এক ‘কনট্র্যাক্ট’ দিয়ে দেওয়া হল। এদেশে পৌঁছেই তিনি চল্লিশ হাজার পাউন্ডে কোনো এক Binn-কে তা বিক্রি করে দেন। Binn একই দিনে তা ষাট হাজার পাউন্ডে অন্য একজনকে বিক্রি করে দেন। শেষ পর্যন্ত যিনি এই ‘কনট্র্যাক্ট’ পেলেন তিনি জানালেন যে উপরোক্ত সব মূল্য চুকিয়েও তিনি প্রচুর লাভ করেছেন।[১০]

মার্কস আরও দেখান যে, ১৭৫৭-৬৬ সময়কালে কোম্পানি অফিসার ও কর্মীরা ছয় লক্ষ পাউন্ড উপহার পান ভারত থেকে। ১৭৭৬ সালে যাকে আমরা ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ বা দুর্ভিক্ষ হিসেবে জানি, মার্কস লিখলেন ঃ ‘The English manufactured a famine by buying up all the rice and refused to sell it again, except at fabulous prices.’[১২] অর্থাৎ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ১৭৭৬-এর দুর্ভিক্ষ তৈরি করে—দেশের সমস্ত ধান কিনে নেয় এবং চড়া দাম ছাড়া তা বিক্রি করতে রাজি না হয়ে। অর্থাৎ সীমাহীন লুণ্ঠন ও দুর্নীতির সাহায্যে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সম্পদ লুঠ করে, যা পরে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ও শিল্প পুঁজির আবির্ভাব এবং বিকাশে সাহায্য করে। মার্কসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ভারতে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের যে অবাধ লুঠ করে, তা ছিল ‘আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন’, যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পশুশক্তি, যুদ্ধ বিক্রয়, উৎকোচ ও দুর্নীতির সাহায্য নেয়। পাশ্চাত্যে পুঁজি আদিম সঞ্চয়নে এই পদ্ধতিরই প্রয়োগ হয়েছে। পার্থক্যটা হল, ভারতের সম্পদ লুন্ঠন করে এদেশে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ন হল না—তা হলো ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ড হয়ে উঠল শিল্প-উন্নত ধনী দেশ—ভারত তার খেসারত দিল এবং দরিদ্র হয়ে উঠল।

উপসংহার

এখানে দুটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে। প্রথমত, মার্কসের পুঁজিবাদ সম্পর্কে মূল থিসিস এখানো অনবদ্য এবং মৌলিকতায় ভাস্বর। কিন্তু পাশচাত্যে কোনো উন্নত দেশে এখনো পুঁজিবাদের পতন উদ্‌ঘাটনকারী সংকট দেখা যায়নি। শিল্পে উন্নত পাশচাত্যের কোনো দেশে আজ পর্যন্ত কোনো বিপ্লব (সমাজতান্ত্রিক) হয়নি। পরবর্তীকালের মার্কসবাদী গবেষক তাত্ত্বিকরা (যেমন ইয়েরগেন হাবেরমাস) দেখিয়েছেন যে, মার্কসের পুঁজিবাদের সংকটতত্ত্ব সঠিক থাকলেও পুঁজিবাদ কেন টিকে আছে তার উত্তর খুঁজতে হবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজস্ব বিকাশের ধারার মধ্যে। পুঁজিবাদের সঙ্গে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যে গভীর যোগ; এই রাষ্ট্র যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বারবার সংকট থেকে উদ্ধার করে চলেছে—এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করলে পুঁজিবাদের যে টিকে থাকার অসাধারণ ক্ষমতা তার মূল কারণটি বোঝা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের অস্তিত্বের যে আন্তর্জাতিক জোটবদ্ধতা—বিশ্বপুঁজির যে আন্তর্জাতিকতা—তা সামগ্রিকভাবে তাকে রক্ষা করে চলেছে। আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, বিশ্বব্যাঙ্ক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (IMF, WTO, World Bank, ADB, EU)—এইসব বহুজাতিক সংগঠনগুলি আজ সারা বিশ্বে পুঁজিবাদের রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ। আজ এমন অবস্থা হয়েছে যে, পুঁজিবাদীদের দেশ দখল করে, যুদ্ধ করে ‘পুঁজি রপ্তানী’ করতে হয় না—গোটা পৃথিবীতে আজ পুঁজিকে সাদরে আমন্ত্রণ করা হয়। আজ বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বপুঁজির অবাধ গতি—সে আর জাতিরাষ্ট্রের সীমানার তেমন ধার ধারে না। সেই কারণে পুঁজিবাদকে এখন ‘মুমূর্ষু’ এবং ‘মৃতপ্রায়’ বলা সঙ্গত হবে কি না তা বিচার্য। মার্কসবাদ একটি গতিশীল তত্ত্ব—আজকের বিশ্বের পুঁজিবাদকে বুঝতে গেলে পুঁজিবাদের বিকাশের সম্ভাবনাগুলিকে অস্বীকার করা যাবে না। সেই সঙ্গে এই আগ্রাসী, লুন্ঠনকারী পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের—যা আমাদের দেশে ১৯৯১ সাল থেকে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ লুঠের এক অবাধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে—তার মুখটি বারবার উন্মোচিত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করা

অত্যন্ত প্রয়োজন। 'গ্রোথ' (Growth)-এর নামে যে Gloom তৈরি করে চলেছে তার প্রতিবাদ জোরদার হওয়া দরকার। মার্কস কিন্তু পুঁজিবাদের সাথে কোনো আপস করেননি। তাঁর সারা জীবনের সংগ্রাম ছিল এই বাজার অর্থনীতি তথা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। শ্রমজীবী মানুষকে সেটা মাথায় রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. মার্কস-এর এই গ্রন্থটি, অর্থাৎ 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম ভল্যুম ১৮৬৭ সালে জার্মানির হামবুর্গ শহর থেকে প্রকাশিত।

২. দ্রষ্টব্য ঞ্ Gramsci, A (1917) 'Revolution Against Das Capital', selection from Political Writings 1910-20' (1977) পৃ. ৩৪-৩৬। গ্রামসির মন্তব্য ঞ্ 'The Bolsheviks reject Karl Marx, and their explicit actions and conquests bear witness that the canons of historical materialism are not so rigid as might have been and has been thought.' (p. 34)। পাছে, এই উক্তির ভুল ব্যাখ্যা না হয়, তিনি বললেন ঞ্ The Bolsheviks are not Marxists—they live Marxist thought. (p. 34)

৩. মার্কসের জীবৎকালে এই গ্রন্থের নানা দেশীয় ভাষায় সংস্করণ বেরিয়েছে, এবং মার্কস নতুন মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন।

৪. দ্রষ্টব্য ঞ্ পেরি অ্যান্ডারসন, 'Considerations on Western Marxism' (London, 1979)

৫. 'পুঁজি' গ্রন্থের ১৮৭২ সালের ফরাসি সংস্করণে মার্কসের মুখবন্ধ।

৬. George Lukas (1922), History and Class Consciousness.

৭. মার্কস, 'পুঁজি', পৃ. ৬৭৩, এইভাবে শোষণের মাধ্যমে তথাকথিত 'জাতির সম্পদ' সৃষ্টিকে মার্কস বলেছেন, 'The Ultima Thule of all Statecraft.'

৮. দ্রষ্টব্য ঞ্ Gramsci, A (1971), Selections from Prison Notebooks (London)

৯. দ্রষ্টব্য Karl Marx on India by Hussain, I, Habib, I ও Patnaik, P (Delhi : 2006)

১০. Marx, K, (1867), 'পুঁজি', পৃ. ৭০৪-০৫

১১. তদেব, পৃ. ৭০৫

১২. তদেব

যুবক মার্কসের একটি কবিতা, ১৮৩৬

অনুবাদ জিয়াদ আলী

সংকটহীন সহজ জীবন নয় তো আমার জন্য,
আ নয়
বর
মহ

আ ও
উ র্ষ,
আ
জ ।

এ ্য
হে া-রাত্রি,
ধূ
আমরা তো নই লক্ষ্যবিহীন তারকাহীন যাত্রী।

ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়া কর্ষ-ক্লেশের মধ্যে
শীতল সরীসৃপের জীবন আমরা তো কেউ চাই না,
আমরা তো চাই সাচ্চা মানুষ যেমন মনের গর্ভে
ফুটিয়ে তোলে ক্রোধ অনুরাগ আবেগ অহং কান্না।

দাস ক্যাপিটাল এখনো কেন প্রাসঙ্গিক? পুঁজির দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

অরূপ চট্টোপাধ্যায়

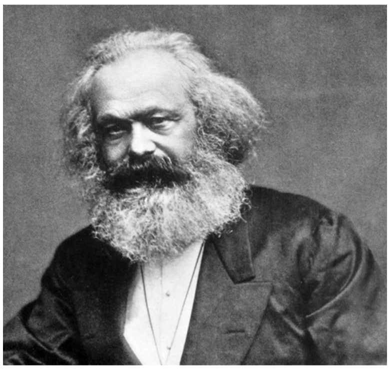

রাশিয়ায় যখন সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ল এবং চীনের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করল, তখন ধনতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতির সমর্থকরা উল্লসিত হয়ে বলতে শুরু করল ‌‌— ''মার্কসবাদের মৃত্যু ঘটেছে। আর 'দাস ক্যাপিটাল' একটি অন্তঃসারশূন্য বস্তাপচা অর্থনৈতিক তত্ত্বের আকর গ্রন্থ।'' কিন্তু এই উল্লাস অচিরেই থেমে গেল। ১৯২৯-৩০ সালের বিপর্যয়ের থেকেও বেশি শক্তিশালী বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রে মহাবিপর্যয় শুরু হল ২০০৭-০৮ সাল থেকে। এই বিপর্যয় থেকে আজও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি মুক্ত হতে পারেনি। সে বিপর্যয়ের কারণে দেখা গেল আমেরিকার মতো দেশের 'ওয়াল স্ট্রিট'-এ বেকার ছাত্র ও যুবদের মহামিছিল ও ধরনা। মানুষ কাজ হারিয়ে বেকারে পরিণত হল। দেশগুলির জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি তলানিতে গিয়ে ঠেকল বা কমে ঋণাত্মক হল। মানুষের সঞ্চিত অর্থ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল এবং বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হল। অন্যদিকে পুরোনো বইয়ের র‍্যাক থেকে নামিয়ে আবার নতুন করে 'দাস ক্যাপিটাল' পড়া শুরু হল। দ্রুত বিক্রির কারণে পুরোনো কপি নিঃশেষ। প্রকাশককে এর নতুন কপি ছাপতে হল। কারণ জনগণ এখন মনে করছে, ধনতন্ত্রের সেই মহাবিপর্যয় থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে এই দাস ক্যাপিটাল থেকেই। যে দাস ক্যাপিটালের শুধু প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল কার্ল মার্কসের জীবদ্দশাতেই ১৮৬৭ সালে। মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যান্য লেখা ও পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করে তাঁরই বন্ধু ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেলস্ পরের দুটি খণ্ড প্রকাশ করেন। অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ ভাষায় লেখা ২০০০ পৃষ্ঠারও বেশি এই বইয়ের খণ্ড তিনটি বিশ্বের সর্বকালে বহুল বিক্রিত বইগুলির মধ্যে অন্যতম। বাইবেল ও কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র পরেই বিক্রিতে এই বইয়ের স্থান। ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হলেও মানুষ এই বইটি আজও পড়েন এর বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিকতার জন্য। স্বল্প পরিসরের এই প্রতিবেদনটি সেই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই।

মানবসভ্যতার ইতিহাস কয়েকটি অবিন্যস্ত ঘটনার সমাহার নয়। এর মধ্যে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সংযোগ ও সূত্র আছে। সেটাকেই তিনি দাস ক্যাপিটালে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্য দিয়ে।

মার্কস নিজে দার্শনিক হেগেলের ছাত্র ছিলেন। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ মার্কসকে প্রভাবিত করে। কিন্তু হেগেলের সেই দ্বন্দ্ববাদ ভাববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মার্কস তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করলেন বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে, যা 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' নামে পরিচিত এবং যে Methodology-র ওপর নির্ভর করে দাস ক্যাপিটাল রচিত। সহজ করে বললে, দ্বন্দ্ববাদ হচ্ছে Thesis ও Anti-thesis এর মধ্যে সংঘাত এবং যা থেকে প্রতিষ্ঠিত হবে Synthesis। 'যা বর্তমানে আছে' তা হচ্ছে Thesis এবং 'যা পরিবর্তিত হতে চাইছে সেটা Anti-thesis। এই দুয়ের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় আগের অবস্থা থাকবে না, আবার যা পরিবর্তিত হতে চাইছে তার সবটা ঘটবে না। পূর্বের স্থিতাবস্থা ও আগত পরিবর্তনের সংমিশ্রণে যে নতুন ভারসাম্য অবস্থা গড়ে উঠবে তা হচ্ছে Synthesis, অর্থাৎ দ্বন্দ্ববাদের মূলে আছে 'সম্পর্ক ও পরিবর্তন'। যখন দ্বন্দ্ববাদে বস্তু

প্রাধান্য পায়, অর্থাৎ বস্তুর প্রথম পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য বস্তু, সম্পর্ক ও ভাবের পরিবর্তন দিয়ে নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পদ্ধতিটিকেই বলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যা দিয়ে মার্কস সমাজ পরিবর্তনের ধারাটিকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মানবসভ্যতার ইতিহাস কয়েকটি অবিন্যস্ত ঘটনার সমাহার নয়। এর মধ্যে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সংযোগ ও সূত্র আছে। সেটাকেই তিনি দাস ক্যাপিটালে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্য দিয়ে।

মানুষের চিরন্তন প্রবণতা হচ্ছে নিজ স্বার্থে প্রকৃতিকে আরো বেশি করে করায়ত্ত করা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের সুখ-সুবিধাকে বাড়িয়ে তোলা। এর জন্য দরকার ব্যবহৃত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির ক্রমশ উন্নয়ন ঘটানো। যে-কারণে আমরা পেয়েছি পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র থেকে ধাতুর ব্যবহার এবং তারও পরে পারমাণবিক হাতিয়ার, হাওয়াকল থেকে পেয়েছি স্টিম ইঞ্জিন, বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র এবং তারপর অটোমেশন, কম্পিউটার, রোবট ইত্যাদি। এই সমস্ত যন্ত্রপাতি দিয়েই তৈরি হয় 'উৎপাদনী শক্তি'। এই উৎপাদনী শক্তির সাথে যুক্ত হয় 'উৎপাদনের সম্পর্ক', যা দিয়ে আমরা পাই একটি 'উৎপাদনের ধরন' (Mode of production)। এখানে উৎপাদনের সম্পর্ক বলতে বোঝায় উৎপাদনের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সম্পর্ক। যেমন প্রভু ও দাস, ভূমিদাস ও জমিদার, পুঁজিপতি ও শ্রমিক ইত্যাদি। মার্কস বলেছেন, প্রথমে উৎপাদনী শক্তি (অর্থাৎ বস্তুর) পরিবর্তন ঘটে, যার জন্য উৎপাদনের সম্পর্কের পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই নতুন 'উৎপাদনী শক্তি' ও 'উৎপাদনের সম্পর্ক'-এর সংমিশ্রণে গঠিত হয় 'উৎপাদনের ধরন'। মার্কসের মতে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের ধরন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সমাজ গঠনের ভিত্তি, যার সাথে 'উপরিকাঠামো' যুক্ত হয়ে আমরা একটি পরিপূর্ণ গঠিত সমাজ পাই। এখানে উপরিকাঠামো বলতে বোঝায় রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি। উৎপাদনের ধরনের অর্থাৎ ভিত্তির পরিবর্তন ঘটলে উপরিকাঠামোর পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে। এই নতুন উৎপাদনের ধরনের সাথে নতুন উপরিকাঠামো সংমিশ্রিত হয়ে আমরা পাই একটি নতুন সমাজ গঠন। মানব সভ্যতার ইতিহাসকে পর্যালোচনা করে মার্কস পাঁচ প্রকার সমাজ গঠনের উল্লেখ করেছেন। যথা—মানুষের বনে জঙ্গলে থাকা অবস্থায় (ক) আদিম সাম্যবাদ, তারপর (খ) দাসপ্রথা, (গ) সামন্ততন্ত্র ব্যবস্থা এবং (ঘ) ধনতন্ত্র। মার্কস বলেছেন এই ধনতন্ত্রের সংকট থেকে মানব মানব সভ্যতার উত্তরণ ঘটবে (ঙ) সমাজতন্ত্রে, যার চূড়ান্ত রূপকে বলেছেন সাম্যবাদ। অতএব এই সমাজ পরিবর্তনের মূলে আছে উৎপাদনী শক্তির পরিবর্তন অর্থাৎ বস্তুবাদ। এই উৎপাদনী শক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি নতুন সমাজ গঠনের জন্য অন্যান্য অংশের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘটে না। এখানেই দেখা যায় শ্রেণি সংগ্রাম, আর সেটাই হচ্ছে দ্বন্দ্ববাদ। সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণি বর্তমানের সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চাইবে। আর শোষিত শ্রেণি সেই সমাজকে পরিবর্তন করতে চাইবে। এই স্বার্থের সংঘাতের কারণে দেখা যাবে সংকট এবং যার নিরসন ঘটবে শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি নতুন সমাজ গঠনের দ্বারা।

ধনতন্ত্রের পূজারীরা বলেন মার্কস বর্ণিত 'ধনতন্ত্রের সংকট' একটি কাল্পনিক ধারণা। যে-কোনো ব্যবস্থার মতো ধনতন্ত্রেও সংকট দেখা দিতে পারে কিন্তু সাময়িক। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে এই সমস্ত তাৎক্ষণিক সংকটের সমাধান করে ধনতন্ত্রের উত্তরণ ও শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। কিন্তু মার্কস বলেছেন, ধনতন্ত্রের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে সংকট। যে-সংসটের ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে ধনতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মার্কস তাঁর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন ক্যাপিটাল বা পুঁজির বৈশিষ্ট্যগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস তাঁর আগের ধনতন্ত্রে বিশ্বাসী এমন ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের (যেমন অ্যাডাম স্মিথ, ম্যালথাস, রিকার্ডো প্রমুখ) মতামত বা তত্ত্বের সমালোচনা করে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

অ্যাডাম স্মিথ তাঁর লেখা 'The Wealth of Nations' (১৭৭৬)-তে উল্লেখ করেছেন, ধনতন্ত্রে বাজারের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে শ্রমের বিভাজন বাড়বে। তার ফলে দ্রুত উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটবে। মার্কসও স্বীকার করেছেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষমতার পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে স্মিথ বলেছেন, ব্যবহারিক মূল্য যাই হোক না কেন, দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনে কতটা শ্রম অন্তর্নিহিত আছে সেটার ওপর। এই বিষয়ে মার্কসের ধারণা আরও স্বচ্ছ ও বিশদ। এখানে মার্কস উদ্বৃত্ত শ্রমের ধারণা প্রণয়ন করেছেন। নিয়োজিত শ্রমের ভিত্তিতে দ্রব্যের যে মূল্য নির্ধারিত হয় তার অতি অল্পাংশ শ্রমিক মজুরি হিসেবে পেয়ে থাকে। বাকি অংশটি হচ্ছে 'উদ্বৃত্ত শ্রম'—পুঁজিপতিরা মুনাফা, খাজনা ও সুদ হিসেবে ভোগ করে। রিকার্ডোর তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা পরে আলোচিত হল।

পরের ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ হচ্ছেন ম্যালথাস। 'An Essay on the Principle of Population' (১৭৯৮) বইয়ে তিনি বলেছেন, কোনো একটি দেশে খাদ্যদ্রব্য বাড়ে গাণিতিক হারে (অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫...) কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে (অর্থাৎ ২, ৪, ৮, ১৬...)। এর ফলে দেশে জনাধিক্য ঘটে এবং শ্রমিক বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম মজুরি পায়। কিন্তু মার্কস যুক্তি দিয়ে বলেছেন, দেশে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা দেখা যাবে অর্থনৈতিক কারণে (ম্যালথাস বর্ণিত বায়োলজিক্যাল কারণে নয়)। যার থেকেই আমরা পাই 'Reserve Army of Labour' অর্থাৎ কর্মহীন শ্রমিকের ভাণ্ডার-এর ধারণা, যা পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে মজুত রাখবে এবং যা দিয়ে মজুরিকে বেঁধে রাখবে মজুরের বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু

দরকার—সেই সর্বনিম্ন হারে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের বন্টন নিয়ে যে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ আলোকপাত করেন তিনি হচ্ছেন রিকার্ডো এবং তাঁর বইটির নাম 'On the Principles of Political Economy and Taxation' (১৮১৭)। এই বইতে তিনি ব্যাখ্যা করলেন 'মূল্যের শ্রম তত্ত্ব' এবং দেখালেন উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের দাম মিটিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে মুনাফা। আর শ্রমিকের মজুরি যত কমবে, এই মুনাফার পরিমাণ তত বাড়বে। মার্কস এই তত্ত্বের নতুন ও সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা দিলেন। 'মূল্যের শ্রম তত্ত্ব' সম্পর্কে মার্কস বললেন, কোনো দ্রব্যের মূল্য হচ্ছে তার মধ্যে সামাজিকভাবে স্বীকৃত যে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের সময় নিয়োজিত আছে সেটা। আর দ্রব্য উৎপাদন করে শ্রমিক যে মূল্য যুক্ত করে তার সবটা পুঁজিপতিরা মজুরি হিসেবে শ্রমিককে দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো শ্রমিক দিনে আট ঘন্টা কাজ করে যে মূল্য যুক্ত করে তার মধ্যে তাকে মজুরি হিসেবে দেওয়া হয়, ধরা যাক, ৩ ঘন্টার কাজের মূল্যের সমান। আর বাকি পাঁচ ঘন্টার কাজ পুঁজিপতিরা ভোগ করে মুনাফা হিসেবে। অর্থাৎ পুঁজিপতিদের মুনাফা আসে উদ্বৃত্ত শ্রম-এর মূল্য থেকে, কারণ শ্রমিকরাই কেবল 'উদ্বৃত্ত মূল্য' সৃষ্টি করতে পারে। এই উদ্বৃত্ত শ্রম বাড়িয়ে পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফা বাড়াতে চাইবে। তার জন্য দরকার শ্রমিকের শোষণ, অর্থাৎ বেশি কাজ করিয়ে কম মজুরি দেওয়া।

কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত বই 'দাস ক্যাপিটাল'-এ পুঁজির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে উদ্ভূত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রথমত, জমি ও শ্রমের মতো পুঁজি একটি দ্রব্য উৎপাদনের সাধারণ উপাদান নয়। উৎপাদন কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কও নির্ধারিত হয় এই পুঁজির মাধ্যমে। দাসপ্রথা বা সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় দাস বা প্রজাকৃষকরা স্বাধীন ছিল না। কিন্তু পুঁজির কারণে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমিকরা পুঁজিপতির কাছে পরাধীন নয়। এখানে শ্রমিকের স্বাধীনতা দু-প্রকারের। শ্রমবিক্রির ক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাধীনতা আছে এবং শ্রমিক শ্রম ছাড়া উৎপাদনের অন্যান্য উৎপাদনের অধিকার থেকে মুক্ত বা স্বাধীন। দ্বিতীয় প্রকার স্বাধীনতা থাকার জন্য (অর্থাৎ অন্য উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত আয়ের সুযোগ না থাকায়) প্রথম প্রকার স্বাধীনতা অলীক। কারণ জীবন ধারণের জন্য শ্রমিকরা শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য—তা যে-কোনো শর্তেই হোক না কেন। এক্ষেত্রে শ্রমিকরা যাতে বেশি মজুরি দাবি করতে না পারে তার জন্য পুঁজিপতিরা দেশে বেকারদের অগ্রবাহিনী মজুত রাখবে। সাম্প্রতিক কালের চিত্র থেকে এই বিষয়টি চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? এখন বিশ্বের সব দেশে, এমনকি খোদ আমেরিকায়, বেকার যুবকদের বিপুল সংখ্যাধিক্য। স্থায়ী চাকরির পরিমাণ কমছে। অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের দিয়ে কম মজুরিতে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আবার কম মজুরি প্রদানের জন্য শ্রমিকদের অকারণে ছাঁটাই বা কাজের 'আউটসোর্সিং'-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দিনে আট ঘন্টা কাজের সময়ের দাবি এখন শ্রমিকরা ভুলে গেছে। কাজের সময় বেড়ে হয়েছে সকাল ৯টা থেকে রাত্রি ৯টা। ধর্মঘট বা আন্দোলনের অধিকার এখন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এসবেরেই উদ্দেশ্য আরো বেশি করে শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে 'উদ্বৃত্ত শ্রম' বাড়িয়ে নেওয়া—যা মুনাফা বাড়ানোর পূর্বশর্ত।

পুঁজির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর কেন্দ্রীকরণ। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে পুঁজি চাইবে কয়েক জনের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগ মার খাবে এবং উৎপাদন ক্রমশ বড় শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে আসবে। যে কারণে আজ দেখা যায় বহুজাতিক সংস্থাগুলির রমরমা এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের মধ্যে কয়েকটি বিজনেস হাউসের সম্পদের অকল্পনীয় বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ, এখন বিশ্বের সমস্ত দেশের কৃষিশস্যের বীজের ও কীটনাশক ঔষধের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকটি মাত্র বহুজাতিক সংস্থা। আবার ভারতের মতো দেশে আদানি-আম্বানিদের সম্পদ বৃদ্ধি অপরিসীম। মার্কস আরও বলেছেন, এই পুঁজির কেন্দ্রীভবনের ফলে সমাজে দেখা যাবে তীব্র বৈষম্য। যেমন, আমাদের দেশে এখন ধনী মাত্র ১০ শতাংশ জনগণের মালিকানায় আছে দেশের ৮২ শতাংশ সম্পদ। আবার ভারতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত মানুষের বাস, এখন একই সাথে বিশ্বে ধনীতম (মাল্টিমিলিয়নিয়ার ডলার) ব্যক্তিদের অনেকেই ভারতীয়। নোবেলজয়ী ফরাসি অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি দেখেছেন বর্তমানে আমেরিকায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্তর সর্বকালীন ও সর্বদেশের মধ্যে বেশি (যা তাঁর ভাষায় 'Probably higher than in any other society at any time in the past, anywhere in the world.')। অতএব আজকের চিত্র মার্কস তাঁর দাস ক্যাপিটালে ১৫০ বছর আগেই অনুধাবন করেছিলেন।

মার্কস পুঁজির তৃতীয় বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করেছেন Commodity Fetishism বা পণ্যমোহ দ্বারা। তিনি বলেছেন, পুঁজির বিকাশের জন্য দরকার সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা। এই ব্যক্তিমালিকানার কারণেই সমাজের সমস্ত সম্পর্ক ও চিন্তাভাবনা নির্ধারিত হয় পণ্য ও অর্থ (অর্থাৎ বস্তু) দিয়ে। উৎপাদন কাজে যুক্ত মালিক (Haves) এবং শ্রমিক (Haves Not)-এর সম্পর্ক বস্তুনির্ভর। মানুষ তার সুখ-শান্তিকে পরিমাপ করে কতটা পণ্যের ওপর তার ক্রয়ক্ষমতা বিদ্যমান সেটা দিয়ে। সমস্ত বিষয়ই যেন বিনিময়যোগ্য অর্থাৎ লেনদেন-উপযোগী। পণ্য ও অর্থের ওপর নির্ভরশীল সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি। এমনকি নীতিনির্ধারকও পণ্যমোহে আক্রান্ত হয়ে দেশের উন্নয়ন বা সুখ সাচ্ছন্দ্যের পরিমাপ করবে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির দ্বারা। মার্কস-বর্ণিত এই বিষয়গুলিই বর্তমানের সমাজে নগ্নরূপে প্রতিভাত। সেটাকেই আমরা এখন বলে থাকি ভোগবাদ বা Consumerism।

পুঁজি সম্পর্কে মার্কস আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যা এই পণ্য মোহ থেকেই উদ্ভূত। সেই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে Alienation বা বিচ্ছিন্নকরণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোনো শ্রমিকই স্বাধীন আত্মোপলব্ধি, সম্পন্ন স্বয়ম্ভূত ব্যক্তি নয়।

শ্রমিকের কাজের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। তার উৎপাদিত দ্রব্য থেকে সে বিচ্ছিন্ন। কাজের ক্ষেত্র শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এমনকি পারস্পরিক সম্পর্কও তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। যেন জীবন্ত প্রাণীগুলি এক একটি সম্পত্তি এবং সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক বাজারে লেনদেন-যোগ্য। যেহেতু প্রায় সকল বিষয় তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সে কারণে মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাববে এবং বেঁচে থাকার জন্য যন্ত্রের মতো কাজ করবে। এর জন্যই হয়তো বর্তমানে অবসাদগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা বেশি।

পুঁজির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হিসেবে মার্কস বলেছেন Glut বা মাত্রাতিরিক্ত উৎপাদনের কথা। পুঁজির একমাত্র লক্ষ্য আরও বেশি বেশি করে মুনাফা অর্জন করা। তা করতে গেলে ক্রমশ উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু শ্রমিকের মজুরি কম রাখায় বা বহু শ্রমজীবী মানুষের বেকার থাকায় (যা আগে বলা হয়েছে) কার্যকরী চাহিদা বাড়বে না। ফলস্বরূপ, ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত দ্রব্য বাজার খুঁজে পাবে না। অর্থনীতিতে মন্দা (Recession) দেখা যাবে। তারই চরমরূপ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ঘন ঘন মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া, সেটা আগের মতো ২০০৭-০৮ সালে আবার ঘটেছে।

মার্কস বলেছেন পুঁজি সর্বদা গতিশীল। কোনো একটি অঞ্চলে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বেশি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পুঁজি বিশ্বব্যাপী বাজারের পরিধি বাড়াতে চাইবে। আরও চাইবে, এই বিশ্বব্যাপী বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দ যেন একই থাকে, যাতে একই ধরনের দ্রব্য সব জায়গায় বিক্রি করা যায়। আঞ্চলিক ও দেশীয় বাজারগুলির সংযুক্তিকরণ এবং শক্তিশালী সংস্কৃতির দ্বারা দুর্বল সংস্কৃতির অধিগ্রহণের মাধ্যমে এখন যে কারণে বহুজাতিক পিৎসা, বার্গার ভারতের বাজার দখল করেছে। একেই আমরা বিশ্বায়ন বা ভুবনায়ন বলে থাকি। অতএব বর্তমানের বিশ্বায়নের কথা মার্কসের বর্ণনা থেকে পাই। পুঁজির এই গতিশীলতার ওপর ভিত্তি করেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদ, লগ্নিপুঁজির বাড়বাড়ন্ত, ফ্যাসিজম— এসবের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। যেগুলি এখনকার সমাজে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে।

এই স্বল্প পরিসরের আলোচনা থেকেই দেখা যাচ্ছে মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' এখনও কতটা প্রাসঙ্গিক এবং এর পাঠ বর্তমানেও কতটা প্রয়োজনীয়। দাস ক্যাপিটালে মার্কস আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করেছেন—যা 'Falling Rate of Profit' অর্থাৎ মুনাফা হারের ক্রমহ্রাসমানতা নামে পরিচিত এবং যার থেকেই ধনতন্ত্রের সংকটের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে, পুঁজি যে-কোনো মূল্যে মুনাফা বাড়াতে চাইবে। তার জন্য দরকার surplus value বা উদ্বৃত্ত মূল্যের বেশি করে সৃষ্টি। এই উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়ানোর জন্য পুঁজিপতিরা চাইবে শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশি কাজ, মজুরি কম রেখে বা না-বাড়িয়ে। এর জন্য দরকার পড়বে—(১) বেকার যুবকদের মজুত অগ্রবাহিনী অর্থাৎ Reserve Army of Labour এবং (২) উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বেশি করে মূলধন (অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ও অটোমেশন) ব্যবহার করে আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমিকের অপসারণ। মার্কস এই উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিকে বলেছেন লুক্কায়িত বা মৃত শ্রম, যা জীবিত শ্রমিকের স্বার্থের পরিপন্থী। উৎপাদন-কাজে লিপ্ত থেকে এই মৃত শ্রম শুধুমাত্র নিজের খরচটাই তুলতে পারে এবং জীবিত শ্রমই একমাত্র উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। মুনাফা বাড়ানোর আশায় শ্রমিকদের অপসরণ করে উৎপাদনকর্মে যত মূলধনের অনুপ্রবেশ ঘটবে তত মুনাফার হার প্রকৃতপক্ষে কমবে এবং একই সাথে কার্যকরী চাহিদা কমবে (শ্রমিক ছাঁটাই ও মজুরি কম থাকার কারণে) ও উৎপাদিত দ্রব্য অবিক্রিত থেকে গুদামঘরে মজুত হতে থাকবে। যার ফলে, পরবর্তীকালে উৎপাদন কমবে এবং আবার শ্রমিক ছাঁটাই হবে। একেই ধনতান্ত্রিক সংকট বা মহাবিপর্যয় নামে অভিহিত করেছেন কার্ল মার্কস। যে সংকটে আজ বিশ্ব আক্রান্ত।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংকট হচ্ছে একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য এবং যাকে এড়ানো সম্ভব নয়। একটি সংকট কাটিয়ে উঠলেও আর একটি বড় সংকটের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাতে জনগণের দুঃখ দুর্দশা বাড়তে থাকবে। বাস্তবে তাই আমরা দেখি স্বর্ণমান (Gold Standard)-এর অবলুপ্তি, ডলার দিয়ে পাউন্ড-স্টার্লিং-এর অপসারণ, ১৯৩০ সালের মহাবিপর্যয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন অর্থনৈতিক সংকট, ব্রেটেনহুড ব্যবস্থা ভেঙে পড়া 'ইন্টারনেট বাবলে', ২০০৮ সালের আর্থিক বিপর্যয় ইত্যাদি।

দাস ক্যাপিটালই দেখিয়েছে এর থেকে মুক্তিপথ শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে সংকট অতীতে দেখা গিয়েছিল তা একটি বাহ্যিক বিষয় (অভ্যন্তরীণ নয়)। এর ধারাবাহিকভাবে সঠিক প্রয়োগে ত্রুটি ছিল। বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতন্ত্রে কোনো ত্রুটি নেই। সেই মুক্তিপথের আশায় আবার 'দাস ক্যাপিটাল' পড়া শুরু হয়েছে।

‘ক্যাপিটাল’—মার্কস ও পিকেটি একটি প্রাথমিক অবলোকন

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

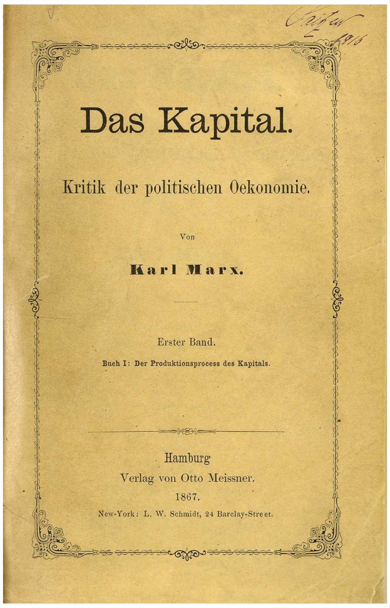

মার্কসের চিন্তার পরিধির সঙ্গে তুলনা ও মানগত বিচারে না গিয়েও বলতেই হয় যে পিকেটির তত্ত্বের কোনো প্রায়োগিক দায়বদ্ধতা নেই। কিন্তু মার্কসবাদ প্রয়োগের দর্শন, তাই কেবল সংশয়মূলক প্রত্যাশায় স্থিত থাকা নয়, স্থিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সাধনই তার লক্ষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্কস ও একবিংশ শতাব্দীর পিকেটির মধ্য এই পার্থক্যটা মৌলিক।

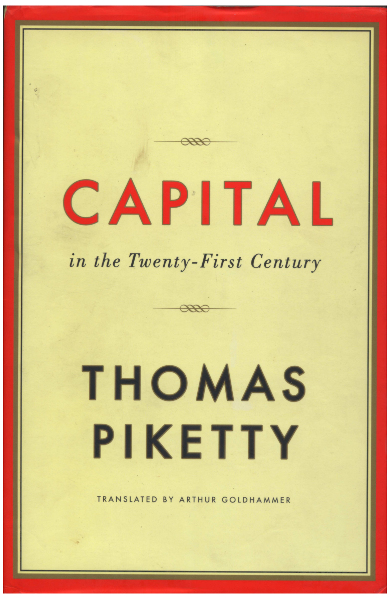

মার্কসের কালজয়ী গ্রন্থ Capital, *A Critique of Political Economy* পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, তার শোষণমূলক চরিত্রের উদ্‌ঘাটন, শোষিত শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমে তার অবসান এবং এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রকরণ ও পদ্ধতি সমন্বিত এক ঐতিহাসিক দিকনির্ণায়ক গ্রন্থ, আজও যা প্রাসঙ্গিক। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে, আজ থেকে ২০০ বছর আগে। বিষয় ‘পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়া’ (The Production Process of Capital)। পরবর্তী খণ্ডগুলির খসড়া তৈরি হলেও মার্কস তাঁর জীবৎকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। ১৮৮৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবন ও কৃতির অবিচ্ছেদ্য সহযোগী বন্ধু এঙ্গেলস-এর সম্পাদনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় ‘পুঁজির প্রচলন প্রক্রিয়া’ (The Process of Circulation of Capital) এবং তৃতীয় খণ্ডের বিষয় ‘পুঁজিবাদী উৎপাদনের সামগ্রিক প্রক্রিয়া’ (The Overall Process of Capitalist Production)। পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালে ‘উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব’ (Theories of Surplus Value) বিষয়ক চতুর্থ খণ্ডটি প্রকাশ করেন দার্শনিক কার্ল কাউটস্কি।

মার্কসের ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের এবার দেড়শো বছর। সাম্প্রতিক কালে ‘ক্যাপিটাল’ নামের আর একটি গ্রন্থ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই গ্রন্থটি ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটি-রচিত Capital in the Twenty-First Century। ফরাসি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে এবং তার ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে। বিখ্যাত ‘The Times’ পত্রিকা অত্যুৎসাহে পিকেটিকে ‘আধুনিক মার্কস’ (the modern Marx) অভিধায় ভূষিত করেছে। বিষয়টি তাই প্রাথমিকভাবেই একটু বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কুড়িটি দেশের বিপুল তথ্য সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পিকেটি এই মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে স্বল্প থেকে স্বল্পতর হাতে সম্পদের ক্রমিক কেন্দ্রীভবন ও তজ্জাত অসাম্য কোনো সাম্প্রতিক বিষয় বা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় তা পুঁজিবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতিরই অন্তর্বস্তু হিসেবে প্রমাণিত। তাই তিনি মনে করেন, সম্পদের এই ক্রমবর্ধমান অসাম্যকে ভারসাম্যে উত্তীর্ণ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বিপন্ন হবে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য পরিণতি ঘটবে অভিজাততন্ত্রে।

পিকেটির মতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মার্কস অসমাম্যের প্রলয়ংকর (apocalyptic) রূপ ধারণের পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের সমাজে অসাম্য ছিল চূড়ান্ত। ব্যক্তিগত সম্পদ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকে খর্ব করে এবং এক দৃঢ় শ্রেণি-কাঠামোর শীর্ষে অধিষ্ঠিত ধনী পরিবারগুলির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ধীরগতিতে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটালেও মূল ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। একমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশৃঙ্খলা এবং মন্দার ফলে উচ্চহারে

কর, মুদ্রাস্ফীতি, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্রমিক বিস্তারের প্রক্রিয়ায় সম্পদের নাটকীয় সঙ্কোচন ঘটে এবং এমন এক পর্যায়ের সৃষ্টি হয় যেখানে আয় ও সম্পদ উভয়েরই বন্টন অপেক্ষাকৃত সমতাবাদী রূপ নেয়। অর্থনীতির মূল কাঠামো, সমৃদ্ধির সৃষ্টি ও বিস্তারের প্রকরণ অবশ্য অপরিবর্তিতই থাকে। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বের অভিঘাত কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও জোরদার হয়ে ওঠে। পিকেটির মতে, নানা মানদণ্ডের নিরিখে আধুনিক আর্থ-ব্যবস্থাসমূহে সম্পদের গুরুত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগের স্তরের জায়গায়ই ফিরে আসছে। অসাম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই পিকেটি তাঁর পুঁজি ও অসাম্যের তত্ত্ব নির্মাণ করেন। যে সহজ সঙ্কেতের মাধ্যমে তিনি এই তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন, তা হলো r>g—যেখানে 'r' হলো পুঁজি থেকে লাভ-এর হার এবং 'g' হলো অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার। পুঁজি বলতে এখানে স্থাবর সম্পত্তি, মজুত ভাণ্ডার সহ মুনাফা, লভ্যাংশ, সুদ, ভাড়া ইত্যাদি সমস্ত রকম আয়জাত সম্পদকেই বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বলতে বোঝানো হয়েছে জাতীয় আয় সহ অর্থনীতির বৃদ্ধির সামগ্রিক উৎপাদনশীলতার মূল্যমানের পরিবর্তনকে। r>g-এর অর্থ তাই, এক কথায়, সম্পদের বৃদ্ধি ঘটে অর্থনীতির চেয়ে দ্রুততর গতিতে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তুলনায় পুঁজি থেকে লাভ তথা সম্পদ বৃদ্ধির হার বেশি হবার কারণেই অসাম্যের সৃষ্টি। এই হার যত বাড়বে, অসাম্যও তত বাড়বে।

পিকেটির গবেষণায় দেখা যায় মানব ইতিহাসে পুঁজি থেকে লাভ সর্বদাই ৪ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। কেবলমাত্র শিল্প-বিপ্লবের কালে ৫ শতাংশের উপরে উঠলেও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভগেই আবার তা ৫ শতাংশের নিচে নেমে যায়। অন্যদিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি শিল্প-বিপ্লবের কাল পর্যন্ত শূন্য শতাংশের সামান্য উপরে ঘোরাফেরা করলেও শিল্প-বিপ্লবের কালে ২ শতাংশের কাছে উঠে আসে। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ৪ শতাংশের আশেপাশে থাকলেও প্রথমে ধীরে ধীরে ও পরে দ্রুতগতিতে আবার তা কমে যেতে থাকে। 'r' এবং 'g'-র মধ্যে পার্থক্য যত বাড়তে থাকে সম্পদের কেন্দ্রীভবন এবং অসাম্যও তত বাড়তে থাকে। শুধু তাই নয়। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যত বেশি সম্পদ, তার বৃদ্ধির হারও তত বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৭ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিশ্বের একজন গড় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সম্পদ বিনিয়োগে লাভ ছিল ২.১ শতাংশ, কিন্তু একজন গড় কোটিপতির লাভ ছিল ৬.৫ শতাংশেরও বেশি। এই পার্থক্যের যা পরিণতি তার সর্বোত্তম উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে জনগণের ধনীশ্রেষ্ঠ এক শতাংশ দেশের মোট সম্পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশের মালিক। এ যেন একটি চার-তলা হোটেলের সর্বোচ্চ তলে মাত্র একজনের বাস, নিচের তিনটি তলায় থাকে বাকি ৯৯৯ জন, যার মধ্যে আবার ৮০০ জনই থাকে এক তলায়। বর্তমান কালে এই চূড়ান্ত অসাম্য অসন্তোষকে ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।

মার্কস একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে, অর্থাৎ উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন অর্থে, পুঁজি (Capital)-র চরিত্র নির্ণয় করেছেন। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রমিককে তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য না দিয়ে কীভাবে মুনাফা হিসাবে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের শোষণ-প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতিরা সম্পদশালী হয়ে উঠছে তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু পিকেটি পুঁজিকে শুধু উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন হিসেবে নয়, ব্যাপকতর অর্থে নানা সূত্রে অর্জিত সামগ্রিক সম্পদ (Wealth)-কে বুঝিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান সম্পদগত অসাম্য যে কোনো আপতিক ঘটনা নয়, এবং পুঁজিবাদেরই মৌল বৈশিষ্ট্য, এ বিষয়ে অবশ্য তাঁর কোনো সংশয় নেই। তাহলে মার্কস-কথিত 'উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পুঁজিবাদ' (patrimonial capitalism) থেকে অর্থনীতির অভিমুখকে ঘুরিয়ে আনতে গেলে করণীয় কী? মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের শোষণমূলক চরিত্রের বিশদ বিশ্লেষণ করে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমে তার অবস্থান ঘটিয়ে এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও তার প্রকরণ নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু পিকেটি সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য কেবল পুঁজিবাদেরই এক মানবিক মুখের প্রত্যাশী। যে সমাধানসূত্র দিয়ে পিকেটি তাঁর পুস্তক সমাপ্ত করেছেন তা হলো, দ্রুত বর্ধমান অসাম্য ও তজ্জাত অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে রক্ষা করার জন্য সব দেশের সরকারকেই এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং বৈশ্বিক স্তরে সম্পদের ওপর কর আরোপ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পুঁজিবাদের অবসান নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় স্তরে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান আয়কর এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ২ শতাংশ পর্যন্ত সম্পদ কর আরোপের সুপারিশ করেছেন তিনি। এই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে তা আদৌ সম্ভব হবে কিনা সে-বিষয়েও তিনি নিজেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। সংশয়ই তো স্বাভাবিক, কেননা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি যেখানে পুঁজিবাদেরই করায়ত্ত, সেখানে তার কাছে আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের এই প্রত্যাশা অলীক কল্পনা মাত্র। পুঁজিবাদের চরিত্রগত অসাম্যের সুতীব্র সমালোচক হয়েও পিকেটি কোনো মৌলিক বিকল্পের সন্ধানে না গিয়ে পুঁজিবাদের মানবিক মুখের সংশয়-লাঞ্ছিত প্রত্যাশাতেই তাঁর তত্ত্বের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

মার্কসের চিন্তার পরিধির সঙ্গে তুলনা ও মানগত বিচারে না গিয়েও বলতেই হয় যে পিকেটির তত্ত্বের কোনো প্রায়োগিক দায়বদ্ধতা নেই। কিন্তু মার্কসবাদ প্রয়োগের দর্শন, তাই কেবল সংশয়মূলক প্রত্যাশায় স্থিত থাকা নয়, স্থিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন সাধনই তার লক্ষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্কস ও একবিংশ শতাব্দীর পিকেটির মধ্য এই পার্থক্যটা মৌলিক। পিকেটি অবশ্যই একালের একজন বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী চিন্তক, কিন্তু তাঁর মধ্য মার্কসের আধুনিক প্রতিরূপের সন্ধান এক অবান্তর প্রয়াস।

রাশিয়ায় দ্বৈতবিপ্লব ও ইতিহাস সৃষ্টির ইতিকথা

কল্যাণ সান্যাল

> ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তির সতের বছর আগে কার্ল মার্কস প্রয়াত হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর সতের বছর পর কার্ল মার্কস পুনর্জীবন লাভ করেছেন।
>
> —*লিও হুবারম্যান*

১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের জয়লাভ সঠিক অর্থেই মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগিক সাফল্যের অনন্য প্রমাণ। এতদিন যা ছিল শুধুই তত্ত্ব, শুধুই স্বপ্ন তা বাস্তবে রূপ পেল রাশিয়ায়, একটি নয়—দুটি বিপ্লবে। প্রথমে ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারি (সংশোধিত ক্যালেন্ডারে মার্চ) মাসে সংগঠিত বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তারপর সেই বছরই অক্টোবর (নভেম্বর) মাসে সংগঠিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। অক্টোবর বিপ্লবকে যাঁরা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেছেন তাঁরা অনেক কথার মধ্যে সবথেকে বেশি করে যা বলেছেন তা হল রুশ বিপ্লবে একদল মানুষ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হঠাৎ করে অভ্যুত্থান ঘটি... ...য়ার মতো একটি পশ্চাৎপদ দেশে সম... ...কি ছিল না। আর তারাই আবার প্রায় ... ...ভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর উল্লাসে... ...ঢ় সত্য হল এটাই যে সমাজতন্ত্রের অ... ...বনা স্থান পায়নি। অবশ্য সমাজতন্ত্রের ... ...ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল—সমাজতন্ত্রে... ...করার। কিন্তু সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে... ...ন উল্কার গতিতে এগিয়ে গেছে—শিল্পে... ...এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে। দ্বিতীয় বিশ্ব... ...ত ইউনিয়ন এগিয়ে গেছে। তার আগে ... ...ান্ত্রিক বিশ্বের ঘুম কেড়েছিল। কিন্তু ... ...ত পারেনি। কোন যাদুমন্ত্রে এমন একটি... ...ই ব্যবস্থা এতগুলি বছর ধরে একটি পি... ...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ করে তুলে... ...নেওয়া আজ খুব জরুরি একটি প্রয়োজন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগের রাশিয়া ঠিক কেমন ছিল সেটা না জানলে পরিবর্তনটা কতটা বৈপ্লবিক ছিল তা বোঝা যাবে না। জারের নেতৃত্বাধীন এক রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসনে রাশিয়ার মানুষ ছিলেন নিষ্পেষিত অবস্থায়। বড় মাপের জমি-মালিকরাই ছিলেন শাসকশ্রেণির অংশ। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় শিল্পশ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ সেনার এক স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। দরিদ্র মানুষের ওপর চড়াহারে কর আরোপ-এর প্রতিবাদেই মূলত সংগঠিত সেন্ট পিটার্সবার্গে এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদসভা সরকারের গুলিবৃষ্টির শিকার হয়। কিন্তু গুলিবর্ষণ করেও জনগণের

> রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার এই দুরূহ আগ্রহ লেনিনকে তাড়িত করেছিল রাশিয়ার কথা ভেবেই নয়। রাশিয়ায় বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি তাকে উৎসাহিত করেছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং দেখাচ্ছিলেন বিশ্ববিপ্লবের।

অসন্তোষ পুরোপুরি স্তব্ধ করা যায়নি। যুদ্ধজাহাজ 'পোটেমকিন'-এর নাবিক বিদ্রোহ এই সময়েরই ঘটনা। সেন্ট পিটার্সবার্গেই একটি শ্রমজীবী মানুষের পরিষদ গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় নিকোলাস বাধ্য হলেন একটি নির্বাচিত আইনসভা—'দুমা' গড়ে তুলতে। ১৯০৬ সালে প্রথম এই দুমা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের অসন্তোষকে ধামাচাপা দেওয়া। সমাজতন্ত্রী দলগুলি সেটা বুঝতে পেরেই দুমাতে অংশগ্রহণ করেনি। পরপর তিনটি দুমা সম্রাটের হস্তক্ষেপে ভেঙে যায়। কিন্তু চতুর্থ দুমা (১৯১২-১৭) ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারিতে সম্রাটের দুমা বাতিলের একটি আদেশ মানতে অস্বীকার করে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। এই সিদ্ধান্তের তিন দিনের মধ্যে সম্রাটকে গদিচ্যুত করা হয়। কিন্তু এর পরেই দুমার ভাঙনও শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতেই রাশিয়ায় শুরু হয়ে যায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লব। এই বিপ্লব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অসংগঠিত। কিন্তু চরিত্রগতভাবে এই বিপ্লব ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ধাঁচের। একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিস্থিতি সেদিন গড়ে উঠেছিল রাশিয়ায়। ইউরোপের অনেক দেশেই ইতিপূর্ব তেমন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা গেছে। ফলত রাশিয়াতেও একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সেদেশের অনেক মানুষকেই আবেগের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যিনি এই আবেগের দ্বারা তাড়িত না হয়ে অন্য ভাবনায় ভাবিত হয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন আরো বড় মাপের এক পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিতে, তাঁর নাম হল ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন শেষে দেশে ফিরলেন। জারের পতন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে করতে কয়েক শত লেনিন-অনুগামী উপস্থিত হলেন পেট্রোগ্রাদের ফিনল্যান্ড স্টেশনে—হাতে তাদের ফুল ও সুসজ্জিত ব্যানার এবং মুখে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের জয়ধ্বনি। কিন্তু তাদের সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে লেনিন বলে বসলেন যে রাশিয়ায় একটি দ্বিতীয় বিপ্লব প্রয়োজন যার নেতৃত্বে থাকবেন সর্বহারারা। এই বিপ্লব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং তার উপযুক্ত সময় এখন উপস্থিত। বুর্জোয়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অপসারণ ছিল তার কাছে সব থেকে আগে করে ফেলার মতো কাজ। বলশেভিক দলের এপ্রিল (১৯১৭) সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধিদের বোঝাতে চাইলেন যে একদিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষকের সোভিয়েত সমূহের দ্বৈত ক্ষমতা কতটা বিপজ্জনক। 'সোভিয়েতের হাতে সব ক্ষমতা' ছিল সেদিনের শ্লোগান। লেনিন দাবি জানালেন, জমির জাতীয়করণ এবং কৃষকদের মধ্যে বন্টন, কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। এই পর্যায়ে লেনিন শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখলের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতিকে। লেনিন এটা জানতেন যে, সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করলে হয় শ্রমজীবী শ্রেণি শাসক শ্রেণির আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করে বিপ্লব সমাধা করবে অথবা তারা সুযোগ হারিয়ে আরও একবার শাসকশ্রেণিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার সুযোগ দিয়ে ফেলবে। অনেক ভেবেচিন্তেই তিনি সর্বহারাকে বিপ্লবে আগ্রহী হবার ডাক দিলেন। একথা লেনিনের অজানা ছিল না যে বিপ্লবকে সফলভাবে সমাধা করা খুব সহজ কাজ নয়। সে কাজ যে কেউ, যখন তখন, যেখানে সেখানে করে ফেলতে পারে না। বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে বিপ্লবের অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর। কোনো গোপন বোঝাপড়া, অথবা একটি দলের ওপর তা নির্ভর করে না। লেনিনের সেই সময়ের রচনা 'বলশোভিকরা কি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে' এই বিতর্কে এক মূল্যবান দলিল। বিপ্লবের পক্ষে অনেক যুক্তি তুলে ধরে তিনি বিপ্লব-বিরোধীদের এই যুক্তিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন যে বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না, কারণ পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানালেন যে, যদি কোনো বিপ্লবের সূচনা এমন কোনো পরিস্থিতিতে হয়েও থাকে যাকে খুব জটিল কিছু বলে মনে হচ্ছে না, তাহলে বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই অভূতপূর্ব জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাঁর মতে, পৃথিবীতে এমন কোনো মহান বিপ্লব একটাও ঘটেনি যেখানে গৃহযুদ্ধ ছাড়াই বিপ্লব সমাধা হয়েছে। তাই তাঁর অননুকরণীয় পরামর্শ ছিল—''যদি তুমি নেকড়ে দেখে ভীত হও, জঙ্গলে যেও না।''

'সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলের দুর্বলতম গ্রন্থি' রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার এই দুরূহ আগ্রহ লেনিনকে তাড়িত করেছিল রাশিয়ার কথা ভেবেই নয়। রাশিয়ায় বিপ্লবের উপযোগী পরিস্থিতি তাকে উৎসাহিত করেছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং দেখাচ্ছিলেন বিশ্ববিপ্লবের। বিশেষত, ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির বৈপ্লবিক রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা ভেবে। প্রথম দিকে অল্প কিছু মানুষকেই তিনি তাঁর সঙ্গে পেয়েছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করলেন অনেকেই। অবশেষে ২৫শে অক্টোবর (৭ নভেম্বর) ১৯১৭ বলশোভিকরা যখন উইন্টার প্যালেস দখল করলেন তখন খুব কিছু বাধা পেতে হল না। 'রুটি, শান্তি ও জমি'-র দাবিকে তুলে ধরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আসল লড়াই এবার শুরু হল। শহর ছড়িয়ে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই লড়াইয়ে বলশেভিকদের জয়লাভ বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু তাঁরা জয়ী হলেন অনেক প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে।

রাশিয়ায় বলশেভিকরা জয়ী হলেন ঠিকই, কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের যে স্বপ্ন তাঁরা লেনিনের নেতৃত্বে দেখেছিলেন তার সফল রূপায়ণ হলো না। ইউরোপ, বিশেষত পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সোভিয়েত ব্যবস্থার মতোই ভেঙে পড়েছে। গভীর হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গত কারণ আছে ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থকদের অরও কিছুটা তত্ত্বনিষ্ঠ হতে হবে।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সাত দশকেরও বেশি স্থায়ী হয়েছিল। একটি প্রায় অনুন্নত ভূখণ্ডকে অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে পাল্টে ফেলা গিয়েছিল তা কোন্ জাদুবলে সম্ভব হয়েছিল ভেবে দেখা প্রয়োজন। ১৯৩২ সালে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার সাংবাদিক ওয়াল্টার ডুরানটি মন্তব্য করলেন যে সমাজতন্ত্রের কাঠামো নির্মাণের কাজটি সোভিয়েত ইউনিয়নে শেষ হয়েছে। তিনি দেখাতে পেরেছিলেন যৌথ সুফল প্রাপ্তির জন্য যৌথ কর্মকাণ্ডের এক অখণ্ড যজ্ঞকে। শিল্পে যৌথ মালিকানা এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন অনেকেরই নজর কেড়েছিল। বিপ্লব পরবর্তী দিনগুলিতে রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল সর্বশক্তি প্রয়োগ করে উন্নয়ন ঘটানো। উন্নয়নে ইংল্যান্ড, জার্মানি বা আমেরিকার কাছাকাছি পৌঁছানোর কথা তাঁরা ভাবতেন না। চেষ্টা ছিল ইতালি, সুইডেন কিংবা অস্ট্রেলিয়াকে ছুঁয়ে ফেলার। রেলপথ, কারখানা, যন্ত্রপাতি যেটুকু ছিল সব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কোনো বিদেশি সাহায্য বা ঋণ পাওয়ার প্রশ্নই নেই। পুঁজির সঞ্চয় অনুপস্থিত। এই অবস্থাতেও উৎপাদনে অগ্রগতির রহস্য উদ্ঘাটনে সবাই নেমে পড়লেন। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬-এর সম্পাদকীয়তে লিখতে বাধ্য হলেন—সংশয়ী পৃথিবীকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে যৌথ মালিকানা (রাশিয়াতে) ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রমিকের জন্য এটা একটা নতুন উৎসাহ এবং এক নতুন ধরনের স্বদেশপ্রেম সৃষ্টি করেছে।

এভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠল একটি আধুনিক শিল্পায়িত রাষ্ট্র এবং একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তি। আর ঠিক সে কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সব থেকে বেশি সইতে হল সোভিয়েত ইউনিয়নকেই। অনেক প্রাণ বিনষ্ট হল, অনেক নগর-গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। অনেক কলকারখানা-রেলপথ বিলুপ্ত হল। কিন্তু তার পরেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন—সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেই।

কিন্তু শেষ চারটি দশকে কী এমন ঘটল যে সমাজতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে মুখ থুবড়ে পড়ল। নাকি শেষ চারটি দশক নয়, পতনের কারণ অনেক আগেই সৃষ্ট হয়েছিল—হয়ত বা শুরু থেকেই। বিপ্লবের কয়েক বছর পরেই বলশেভিক দলের দশম কংগ্রেস (১৯২১)-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত মতো 'উপদলীয় কার্যকলাপ' সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়াকে কেউ কেউ একটি আদ্যন্ত পার্টি-রাষ্ট্র গঠনের জন্য দায়ী করে থাকেন। এই বক্তব্যটিকে অযৌক্তিক বলা যাবে না। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের শেষের শুরু যাঁর পৌরোহিত্যে সেই মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ব্যবস্থার সংস্কার ঘটিয়ে তাকে গণতান্ত্রিক রূপ দেবার কথা বললেন। কিন্তু তা ছিল কথার কথা। সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার কোনো ইচ্ছা এবং ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। বিনা প্রতিরোধেই সমাজতন্ত্রের পতন ঘটল। ১৯৯১-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হল। কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপার হল এটাই যে মাত্র দু-বছর পরেই ১৯৯৩ সালে রাশিয়াতে কমিউনিস্ট পার্টির পুনরাবির্ভাব ঘটল। সে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব-প্রতিপত্তিও কম নয়। আর দেশের মানুষের কাছে এখনও লেনিন তো বটেই স্তালিনও যথেষ্ট প্রিয় নেতা। এমনকি বিপ্লবের বার্ষিকী যাপনও প্রতি বছরই হয়ে থাকে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে কিন্তু সারা বিশ্বে তার ইতিবাচক প্রভাব আজও অম্লান।

লেনিনের বন্ধু

অরুণ মজুমদার

চার বছরের
ছোট্ট পাভেল
তার নিলুমাসির কাছে
গল্প শোনে—গাছ-গাছালি
ভূতপ্রেত দেশ-বিদেশ
আরো কত কী।

মাসি একদিন ওকে
লেনিন মিউজিয়াম বইটা
পড়ে শোনাচ্ছিল আর
ছোট্ট লেনিন থেকে কবরে শায়িত
লেনিনের ছবিগুলি দেখাচ্ছিল।

এমনি করেই পাভেল
লেনিনকে ভালোবেসে ফেলেছিল।
মাসির কাছে মাঝে মাঝে
আবদার করত—মাসি
আমাকে একদিন লেনিন
মিউজিয়াম দেখাতে নিয়ে যাবে?

সেদিন টিভিতে দেখছিল
পাভেল
একদল লোক পাশবিক
উল্লাসে ক্রেন দিয়ে লেনিনের
মূর্তিটা ভাঙছে...
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পাভেল
মা লোকগুলো কী শয়তান!
লেনিনকে মেরে ফেলছে...
আমার বন্দুকটা নিয়ে এসো তো..

তথ্যসূত্র

১. ক্লিফ স্লটার, *মার্কস অ্যান্ড মার্কসিজম স্থ অ্যান ইনট্রোডাকশন*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৮
২. লিও হুবারম্যান, *ম্যানস ওয়ার্লডলি গুডস্*, পিপলস্ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬
৩. রাজকুমার চক্রবর্তী, *রুশ বিপ্লব স্থ শতবর্ষে ফিরে দেখা*, অনিল আচার্য (স.), 'অনুষ্টুপ', বর্ষ ৫২, সংখ্যা ১, ২০১৭

লেনিন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ

সুধীর রায়

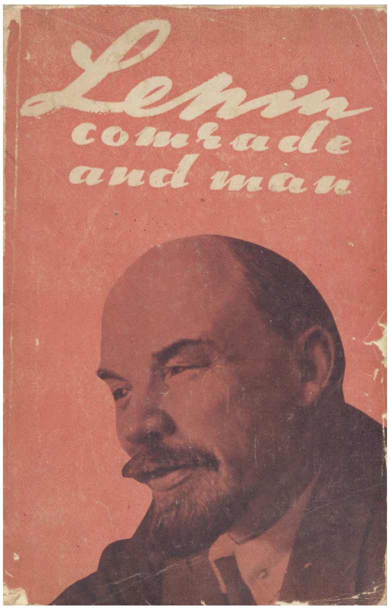

ভ্লাদিমির ইলিচ সম্পর্কে কিছু লেখার আগে আমি স্মৃতিচারণ করতে চাই কিভাবে আমি প্রথম স্মলনিতে যাই এবং কিভাবে তাকে দিনের পর দিন সেবা করি। আমার স্বামী পেট্রোগ্রাডে কাজ করতেন। তিনি প্রথম থেকেই রেডগার্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অক্টোবর মাসের পর তিনি স্মলনিতে কাজ শুরু করেন। তিনি একদিন আমাকে বললেন যে একজন নির্ভরযোগ্য লোক স্মলনিতে প্রয়োজন যে রান্না ও পরিবেশন করবে। অবশ্য তিনি জানতেন যে আমি তখন বলশেভিকদের খুব বিরোধী। তারা যীশুখ্রিস্টের বিরোধী। তারা হিদেনদের মতোই ঘৃণ্য। তারা মানুষের শুধু অপকার করে বেড়ায় আর ভ্লাদিমির ইলিচ হলেন তাদের নেতা। তাঁকে জার্মানরা রাশিয়ায় পাঠিয়েছিল। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই তর্ক করতাম ঝগড়া করতাম। আমি তাঁকে বলতাম যে সে হিদেনদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে। একদিন আমার স্বামী আমাকে স্মলনিতে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তুমি একটা নির্বোধ স্ত্রীলোক। দেখ এই যীশুখ্রিস্ট বিরোধী লোকটি কেমন।

স্মলনিতে কাজ শুরু করার পর আমি ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখলাম। আমার সঙ্গে আমার ছোট্ট মেয়ে তানিয়া ছিল। তানিয়া তখন ক্রাচ নিয়ে হাঁটত। তার একটা পা প্লাস্টার দিয়ে ব্যান্ডেজ করা থাকত কেননা সে তখন হাড়ের যক্ষ্মায় ভুগত।

ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তানিয়াকে বললেন, এই মেয়ে তোমার পায়ে কি হয়েছে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন আপনি তো কমরেড ওয়েনস্টোভের স্ত্রী। আমি কোনোরকমে তাঁর কথায় উত্তর দিলাম। আমি তাঁর দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিলাম না। আমি তারপর প্রায় প্রতিদিনই ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখতাম। তিনি যখনই আমাদের কাছে আসতেন, আমার মেয়ে তানিয়াকে একটা লজেন্স বা বিস্কুট দিতেন। তিনি তানিয়াকে বলতেন যে শিগ্গিরই এমন দিন আসবে যখন তোমরা অনেক বেশি বিস্কুট বা লজেন্স পাবে। তিনি সব সময়ই আমার মেয়ের সঙ্গে কৌতুকে মেতে উঠতেন। তিনি প্রায়ই আমার মেয়ে তানিয়ার সঙ্গে ফোনে দোতলায় উঠে কথা বলতেন। আমাদের জন্য পারিবারিক রেশন বরাদ্দ খুব বেশি ছিল না। কিন্তু আমি একদিন ভ্লাদিমির ইলিচকে বরাদ্দের বেশি রুটি দিই চায়ের সঙ্গে।

ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন কেন আমি তাঁকে অতিরিক্ত রুটি দিয়েছি। তিনি এমন কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে আমার মনে হল যেন পৃথিবী আমাকে গ্রাস করবে। তিনি আমাকে অতিরিক্ত রুটি ফেরৎ দিলেন। আমার তখন মনে হল ভ্লাদিমির ইলিচ একজন সেইন্ট। তাই যখনই আমি চার্চে যেতাম, তখন লেনিনের নামে একটা মোমবাতি ধরিয়ে প্রার্থনা করতাম। যেদিন পেট্রোগ্রাডের কাছাকাছি এলাকা থেকে শ্বেতসন্ত্রাসকারীরা উচ্ছেদ হল, সেদিন কমরেড লেনিন নিজে রান্না ঘরে এলেন এবং আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তানিয়াকে একটা বিস্কুট দিলেন এবং বললেন তোমাকে একটা স্যানাটোরিয়ামে পাঠাচ্ছি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং হঠাৎ আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত এক কণ্ঠস্বর। কমরেড ইলিচ "আমি আপনাকে ভেবেছি হিদেনদের নেতা, যীশুখ্রিস্ট বিরোধী।"

তিনি তখন আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন "কমরেড ভরনোৎসগভা, আমার সম্পর্কে কত কথাই তো প্রচার হয়েছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে মোমবাতি জ্বালাবার আগে আপনার মেয়ে তানিয়াকে আরও বেশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান। তারপর তিনি যাজকদের সম্পর্কে বললেন যে তারা কত আজগুবি প্রচার করে এবং সাধারণ মানুষরা প্রতারিত হয়।

আমি এখনো ভাবি যে ভ্লাদিমির ইলিচের জন্য আমার মেয়ে এখন সুস্থ জীবনযাপন করছে।

— এন. এন. ভোরোস্তাসোভা। কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের খাদ্য পরিবেশনকারিনী

২.

ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর কমরেডস বা সহযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত থাকতেন। তার ওপর তখন বিরাট কাজের ভার ছিল, কিন্তু এসত্ত্বেও কোন কমরেড অসুস্থ হলে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হতেন। তিনি আমাকে বলতেন যে কমরেড ওয়েসব্রড আমি আপনাকে একটা গাড়ি দিচ্ছি, আপনি ওই অসুস্থ কমরেডকে দেখে আসুন। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে তিনি নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করতেন। যখন তিনি শ্বেতসন্ত্রাসকারী কাপলনের গুলিতে বিদ্ধ হলেন। আমরা ডাক্তাররা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলাম। তাঁর বিছানার কাছে যেতেই তিনি বলতেন যে আমি চমৎকার আছি। আপনি অন্যান্য রোগীদের দেখুন।

তাঁর জন্য সাধারণ মানুষের উদ্বেগের সীমা ছিল না। কিন্তু তিনি একটু ভালো হতেই একটা মেডিকেল বুলেটিনে স্বাক্ষর করে জনগণের হৃদয় জয় করলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ একটু ভালো হতেই আমি হাসপাতালের কাজে আরো বেশি সময় দিতাম। তিনি আমাকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন হাসপাতালে রোগীরা কি খায়। তাদের জন্য কোথা থেকে খাবার আসে। তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পার্কে গিয়ে তিনি অনায়াসেই শিশুদের সঙ্গে মিশতেন।

— বি. এস. ওয়েসব্রড, চিকিৎসক

৩.

কমরেড পি. এস. কায়দেনস্টেভ

প্রিয় কমরেড, আপনি বেলাকুন সম্পর্কে যথাসাধ্য করবেন। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গকে সবরকম ভাবে সাহায্য করবেন। বেলাকুন হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র করেন। হাঙ্গেরির সোভিয়েত সরকার তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৯ সালে সেই সরকারের পতন হলে তিনি অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যান। সেখানে তাকে অন্তরীণ করা হয়। মুক্তির পর তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় চলে আসেন।

ইতি, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

সূত্র : Lenin : Comrade and Man, Progress Publisher, Moscow.

লেনিন
ল্যাংস্টন হিউজ

লেনিন সারা দুনিয়া জুড়ে হাঁটেন
কোনো দেশের কোনো সীমানা তাঁকে বাধা দিতে পারে না
কোনো সৈনিক-ছাউনি কোনো বাধার প্রাচীর
কোনো কাঁটা-তারের বেড়া
তাঁর চলার গতিকে থামাতে পারে না।

লেনিন সারা দুনিয়া জুড়ে হাঁটেন
কালো বাদামী সাদা সব মানুষ তাঁকে স্বাগত জানায়
তাঁর সাথে কথা বলতে
ভাষা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না
একেবারে অজানা-ভাষায় কথা বলে যে মানুষ
সে-ও তাঁকে বিশ্বাস করে।

লেনিন সারা দুনিয়া জুড়ে হাঁটেন
যেন একটা দগদগে ক্ষতের মতো সূর্য অস্ত যায়
অন্ধকার আর ঊষার সন্ধিক্ষণে যে-মুহূর্ত
সেই মুহূর্তে জ্বলজ্বল করে ওঠে একটি রক্তবর্ণ নক্ষত্র।

অনুবাদ ঃ কমলেশ সেন

প্রেরণার উৎস নভেম্বর বিপ্লব

শিবানন্দ পাল

সভ্যতার ইতিহাসে নভেম্বর বিপ্লব মানবমুক্তির এক ঐতিহাসিক ঘটনা। রাশিয়ার বঞ্চিত, শোষিত শ্রমিকশ্রেণির পুঞ্জীভূত ক্ষোভের উত্থানে সৃষ্ট নতুন এক শাসনব্যবস্থা, যা দেশে দেশে শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের সামনে এনেছে নতুন স্বপ্নের সন্ধান।

ভাবতে অবাক লাগে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০,০০০। আর জারতন্ত্র নিজেদের অভিজাত জীবনযাপনের স্বার্থে সমাজের বাকি মানুষদের অবদমিত করে রাখার জন্য নিয়োজিত করেছিল ১২ মিলিয়ন সৈন্যের সামরিক বাহিনী। মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে মহান এই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন লেনিন। সামন্তবাদী সমাজ ভেঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে যখন রাশিয়াকে বাঁধতে চেয়েছিল নতুন শোষণে, বিপ্লব তার মূল ধরে টান দিয়েছিল। জন্ম হয়েছিল বহুমাত্রিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী অনন্য বিপ্লবী তত্ত্বের, যাকে আমরা চিনেছি 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' নামে।

জার-শাসিত রাশিয়া ছিল সবচেয়ে পিছিয়ে পরা দেশ। অর্ধেকটা এশিয়া, অর্ধেকটা ইউরোপ। অর্ধেকটা কৃষি, অর্ধেকটা খনিজসম্পদে ভরপুর। ভূমিদাস প্রথার সবচেয়ে পুরনো ব্যবস্থা চলছিল। শিল্পে উৎপাদন কমেছিল, কল-কারখানাগুলো বন্ধ হচ্ছিল, জীবিকাহীন বিশাল শ্রমিকের দল, বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ দেউলিয়াত্বের দিকে নিয়ে চলছিল রাশিয়াকে। খনিতে, রেলওয়েতে, জাহাজে যে শ্রমিকরা কাজ করেন মার্কস-লেনিন-এর লেখাগুলি তাঁদের উৎসাহিত করে। শ্রমিকরা আন্দোলন করলে জারতন্ত্রের শোষণযন্ত্র নির্মমভাবে আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেয়। লেনিন বললেন, 'কী করিতে হইবে'। বললেন, 'এক পা এগিয়ে দুই পা পিছিয়ে'। শ্রমিকরা শহরের রাস্তায় মার খাচ্ছেন। লেনিন লিখলেন, 'গ্রামের গরিবদের প্রতি'। বললেন, শুধু জারতন্ত্রের উচ্ছেদ হলেই হবে না। মূল বাধা সামন্তবাদ। জার আশি লক্ষ হেক্টর জমির মালিক। কিন্তু রাশিয়ার অভিজাতরা লক্ষ কোটি হেক্টর জমির মালিক। এদেরও উচ্ছেদ চাই। ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি দখল করতে হবে। রুটি, জমি, শান্তি আর স্বাধীনতা চাই একসাথে।

বলশেভিক সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ। সভা, সমাবেশ নিষিদ্ধ। খাদ্য ও
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনি
গড়ে, দাম বাড়িয়ে সর
করতে চেয়েছিল, যাতে
থাকতে বাধ্য হয়। গণ-
করার জন্য নেতারা ক
বন্দি, ছিল হত্যার প
নির্বাসন দণ্ড শীতলত
জেল, ছিল লেনিনের
ধনীরা ভেবেছিল, ক্ষু

অস্থিসার বাহুগুলিই বুঝি বিপ্লবের গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করবে! কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটগুলি বাড়িয়েছিল সংগ্রামী তৎপরতা। শ্রমিক, নাবিক, সৈনিক এবং কৃষকদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে লাগাতার ধর্মঘট অবিরাম শ্রেণি সংঘর্ষের সূচনা করেছিল। সকলে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল-বলশেভিকরাই সঠিক। বলশেভিকরা কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগ্রত করতে সমর্থ হয়। জারের বেতনভুক সামরিক কর্মীরা হয়েছিলেন নিষ্ক্রিয়। যুযুধান দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি লড়াইয়ের ময়দানে ব্যস্ত। ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে লেনিন বলেছিলেন, 'অপেক্ষা করা হবে বিপ্লবের প্রতি অপরাধ।'

রাইফেল-কামান-বিমান-যুদ্ধজাহাজ নয়-শ্রেণিচেতনার উন্মেষ, শ্রেণিশত্রু চিহ্নিতকরণ, শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম ও সমবেত শক্তিতে শত্রুকে আঘাত।

প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রমিকদের রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইতিহাসের চাকা ঘুরতে শুরু করে প্রগতির পথে। সোভিয়েত রাশিয়া ক্রমে পরিণত হয় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে। বিশ্ব হয় দ্বিধা বিভক্ত। পুঁজিবাদ নয় সমাজতন্ত্র! ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা পেল, জার্মানিতে রাজতন্ত্রের পতন, হাঙ্গেরিতে জয় এল, আমেরিকার শ্রমজীবীরাও প্রবল উদ্দীপনায় লাফিয়ে উঠল।
মিকদের
তাকামী
ধ্যে চীন
তিসমূহ
অন্ধকার
া একে
পুঁজিবাদ
র্বহারার
একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। লেনিন রাশিয়াকে চালনা করলেন এই পথে। পরবর্তীতে স্তালিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষ প্রায় ৫০ বছর বড় ধরনের যুদ্ধ ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল। কোরিয়াকে দখল করতে পারল না আমেরিকা, ভিয়েতনাম ছাড়তে বাধ্য হল। এমনকি নিজেদের সীমান্ত লাগোয়া কট্টর মার্কিন-বিরোধী সমাজতন্ত্রী দেশ ক্ষুদ্র কিউবাকেও সমীহ করে চলতে বাধ্য হল। বিশ্বের একের ছয় শতাংশ মানুষ এলেন সমাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায়।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রে বিপর্যয় সত্ত্বেও নভেম্বর বিপ্লব আজও প্রেরণার উৎস।

শিল্প-সংস্কৃতি ও মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ

সুকৃতি ঘোষাল

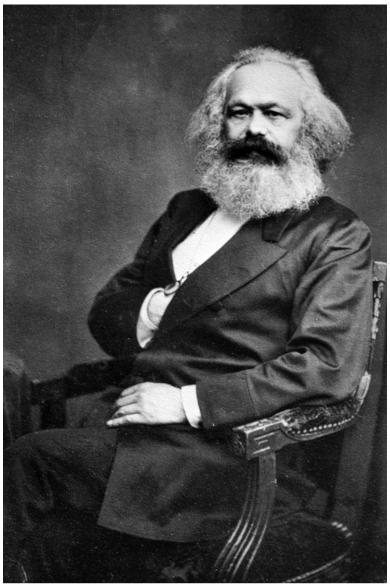

উপরিকাঠামোও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিতটিকে প্রভাবিত করতে পারে। পারে যে, তার বড় প্রমাণ সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী উভয় সমাজেই বহু প্রগতিবাদী সাহিত্য রচিত হয়েছে।

উত্তর-আধুনিক যুগবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিওতার্দ বলেছেন যে এখন 'metanarrative', অর্থাৎ একটা বড় কাঠামো যা দিয়ে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সব স্তরকে ব্যাখ্যা করা যায়, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। মার্কসবাদ এমনই একটি metanarrative যা ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি—সবকিছুকে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিচার করতে চায়। লিওতার্দকে মানলে এ-লেখা নিছকই পণ্ডশ্রম। কিন্তু metanarrative-কে অস্বীকার করা আসলে মার্কসবাদের অন্তর্দৃষ্টিকে নাকচ করার এক বৌদ্ধিক চাল। মার্কস-এঙ্গেলস-এর সময় থেকে বর্তমান সময় অনেক আলাদা, এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু দ্বান্দ্বিকতার বস্তুবাদী তত্ত্ব যুগনিরপেক্ষ; দ্বন্দ্ব আলাদা কিন্তু দ্বান্দ্বিকতা সত্য—ইতিহাস ঘেঁটে মার্কস তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আজকের প্রেক্ষিতে শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে মার্কসীয় ভাবনা আর একবার ঝালিয়ে নেওয়াই যায়। শুধু একটা বিষয় প্রথমেই স্পষ্ট করা দরকার—মার্কসবাদ যেহেতু একটা প্রয়োগমুখী মতবাদ, লেনিন থেকে মাও যাঁরাই মার্কসবাদ সফলভাবে প্রয়োগে উদ্যোগী হয়েছেন তাঁদের ভাবনাও এ-লেখায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

উৎপাদক মানুষের পরিচয়টি মার্কসবাদে কেন্দ্রীয়। কিন্তু পশুও তো উৎপাদন করে, উভয়ের ভূমিকার তফাৎ করে মার্কস বলেছেন যে, যা কিছু নিতান্তই অস্তিত্বের প্রয়োজনে লাগে পশু তাই উৎপাদন করে; কিন্তু মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুও উৎপাদন করতে সক্ষম এবং প্রয়োজন-নিরপেক্ষ ভাবে যখন যে উৎপাদন করে সেটাই উৎকৃষ্ট উৎপাদন (অন্যপ্রাণী 'produces only under dominion of immediate physical need, whilst man produces even when he is free from physical need and only truly produces in freedom therefrom.' —Marx)। শিল্প-সংস্কৃতি মানুষের এই প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনেচ্ছার ফসল, কারণ শিল্প নিয়ে কারুর পেট ভরে না, জৈবিক তৃষ্ণা মেটে না। উৎপাদন প্রসঙ্গে মার্কস প্রয়োজন-নিরপেক্ষ সৃষ্টির কথা কেন আনলেন? এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি পরেই বলেছেন—'For the starving man, it is not the human form of food that exists; but only its abstract being as food'। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করে না, খাদ্য তার কাছে শুধুমাত্র উদরপূর্তির উপকরণ, মার্কস যাকে খাদ্যের 'crudest form' বলেছেন। এই প্রয়োজন-অতিরিক্ত উৎপাদন কায়িক বা মানসিক উভয়ভাবেই করা যায়—যে সূত্রে কারু ও চারুশিল্পের স্বতন্ত্র রূপ চিহ্নিত হয়। এখন প্রশ্ন হল, ক্ষুধার রাজ্যে, যেখানে পৃথিবী গদ্যময়, সেখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত সৃষ্টি কি বিলাসিতা নয়? মার্কসবাদ কিন্তু আমাদের তা শেখায় না। ট্রটস্কি বলেছেন— 'The development of art is the highest test of the vitality and significance of each epoch'। অর্থাৎ শিল্প-সংস্কৃতির নিরিখেই তিনি সভ্যতাকে মাপতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন? সমাজ পরিবর্তন আগে হোক, সবার জন্য অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হোক, তারপর না হয় সংস্কৃতির চর্চা হবে—কেউ এমন বলতেই পারেন। অগ্রাধিকারের বিষয়টা ফেলার নয়। মার্কস কিন্তু শিল্প-সাহিত্যকে উপরকাঠামোয় স্থান দিলেও অপ্রধান বলেননি। এই

জায়গাটায় সুন্দর আলোকপাত করেছেন মার্কসবাদী চিন্তাবিদ Alick West। তিনি বলেছেন, ''Culture is a weapon in the fight for socialism... Socialism is a weapon in the fight for culture।" অর্থাৎ লক্ষ্য যদি হয় সকলের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা, যা একমাত্র সমাজতন্ত্রই সুনিশ্চিত করতে পারে, তাহলে সংস্কৃতিকে মানুষের চেতনা উন্মেষের কাজে লাগাতে হবে। তাহলে কি সমাজতন্ত্র অর্জিত হলে সংস্কৃতির প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে? মোটেই না। সংস্কৃতির লক্ষ্য সকলের জীবনের মানোন্নয়ন, ওয়েস্টের ভাষায় 'heightening of life', অর্থাৎ জৈবিক প্রয়োজন মিটিয়ে মানসিক তৃপ্তির আস্বাদ দেওয়া। সেটা সমাজতন্ত্রেই সম্ভব, কেননা সমাজতন্ত্রে শিল্পের চরিত্র শ্রেণি-নিরপেক্ষ।

সংস্কৃতিকে সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে দেখতে হলে একটা বড় প্রশ্নের মীমাংসা প্রথমে হওয়া দরকার। মার্কসীয় দর্শনে সংস্কৃতির স্থান উপরিকাঠামোয়; ভিতই তো উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে, উল্টোটা তো নয়। এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, কেউ overdetermination বা একের বদলে বহুবিধ কারণের তত্ত্ব এনেছেন। সে যাই হোক, একটা বিষয়ে সকলে এখন একমত, উপরিকাঠামোও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিতটিকে প্রভাবিত করতে পারে। পারে যে, তার বড় প্রমাণ সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী উভয় সমাজেই বহু প্রগতিবাদী সাহিত্য রচিত হয়েছে। লেনিন টলস্টয়কে বিপ্লবের আয়না বলেছেন, শ্রেণি-ঝোঁকের ভিন্নতা সত্ত্বেও বালজাকের রচনায় এঙ্গেলস অভিজাত শ্রেণির প্রতি শাণিত বিদ্রূপের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু তাঁর লেখা সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা প্রতিটি মানুষের অনুপ্রেরণা। সংস্কৃতি যে অর্থনৈতিক ভিতকে ধসিয়ে দিতে পারে তার অন্য একটা বড় প্রমাণ, সমাজপ্রভুরা সংস্কৃতিকে নিজের স্বার্থে চালনা করতে চান। Althusser দেখিয়েছেন যে স্থিতাবস্থাকামী শাসক কেমনভাবে ideology বা ভাবাদর্শকে State Apparatus হিসেবে ব্যবহার করে। সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে ভিত-ধসানোর ক্ষমতা না থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হতো না।

এখন প্রশ্ন হল, শিল্প-সংস্কৃতির এই অন্তর্ঘাত ঘটানোর ক্ষমতার রহস্য কী? এর উত্তর খুঁজতে হলে ব্যক্তি, সমাজ ও চেতনার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বুঝতে হবে। ব্যক্তি-মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করে সমাজ। শিল্পী একজন ব্যক্তি—তিনি সমাজের অংশ। তাঁর চৈতন্য তাঁকে সমাজের অন্য ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করে বটে কিন্তু সে চৈতন্যের উপকরণ আহৃত হয় সমাজ থেকেই। লেনিন, কথাটাকে সহজ করে বলেছেন—'Man's consciousness not only reflects the objective world, but creates it।' অর্থাৎ মার্কসীয় দৃষ্টিতে মানবমনে চেতনা পূর্বপ্রোথিত নয়, যাপন সূত্রে অর্জিত। কিন্তু তার একটা সৃষ্টি করার বা রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতা আছে। সৃজনশীলতা হল বাস্তব থেকে নিয়ে তাকে নবতর রূপে উপস্থিত করার ক্ষমতা। এই উপস্থাপনা যেহেতু বাস্তবের পুনর্নির্মাণ, তাই যে সমাজবাস্তবতা থেকে ভাবটির জন্ম, তার থেকে সেটা পৃথক হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট ভাবধারা থেকে শিল্পের জন্ম হলেও, শিল্পকর্মটি সেই নির্দিষ্ট ভাবাদর্শকে সমালোচনা বা চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম। তাই প্রাক্‌সমাজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় ও প্রগতিবাদী ভাবনার দেখা মেলে যে যুগের শিল্প সংস্কৃতিতে। সেই সমালোচনা সবসময় সরাসরি করা হয় তা নয়। কখনো সেটা ইঙ্গিতমাত্র, কিন্তু তবু চিহ্নিত করা যায়। এর আর একটা কারণ আছে। শোষণ ভিত্তিক সমাজ যে আদর্শ নয়, প্রকৃত শিল্পীর অবচেতনে সে অনুভূতি সঞ্চিত থাকে। তাই যে সমাজে সে বেড়ে উঠেছে, যে সামাজিক অভিঘাতে নির্মিত হয়েছে তার চৈতন্য, তার বিরুদ্ধেই সরবে বা আভাসে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া সাহিত্য যখন মানুষ পাঠ করে, ছবি যখন মানুষ দেখে, তখন শিল্পকর্মটি যে সময়ে রচিত হয়েছিল সেই সময় থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যে সময়ে সেটা উপভোগ করা হচ্ছে সে সময়ে এসে পড়ে। ভাববাদী তাত্ত্বিকরা এটাকেই সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ আবেদন বলেন। এই যে একসময় থেকে অন্য সময়ে গিয়ে পড়া, তা হল এক সমাজের কুসুম অন্য সমাজে গিয়ে পুষ্পিত হওয়া। ফলে শেক্সপিয়র সামন্ততন্ত্রকে বিদ্রূপ করে বা রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে বিদ্ধ করে যা কিছু লিখেছেন, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে চৈতন্য নির্মাণেও বহুকাল পরেও তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

শিল্প-সাহিত্যের এই স্থিতি-বিরোধী সম্ভাবনা আছে বলেই, যারা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন চায় (যেমন মার্কসবাদীরা) তারা চায় শিল্প হাতিয়ার হয়ে উঠুক। আর যারা প্রচলিত সমাজের অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার সুবিধাটুকু পায়, তারা শিল্পকে নিছক বিনোদন বলে চালাতে চায়। সমাজ কী চায় দেখার আগে শিল্পী কী চায় তা দেখা দরকার। শিল্পী খবরদারি চায় না, স্বাধীনতা চায়। জরাগ্রস্ত অবক্ষয়িত সমাজ শিল্পীর চেতনায় প্রত্যাখ্যাত তো হবেই, তাহলে আর শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের আদৌ দরকার আছে কি? কথাটার গুরুত্ব মার্কসবাদীরা বোঝে, তাই স্রষ্টার স্বাধীনতায় তারা বিশ্বাস করে। কিন্তু সব স্বাধীনতার মতো এই স্বাধীনতাও অবাধ হতে পারে না। স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছাচার, সৃষ্টি যখন সমাজ পরিবর্তনের গতিকে শ্লথ করতে থাকে, তখন মার্কসবাদীরা শিল্পীর কাছে সংযম প্রত্যাশা করে। অবাধ স্বাধীনতার পক্ষে যে শিল্পীরা ওকালতি করেন, তাঁদের কাছে লেনিনের মোক্ষম প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গে স্মরণে আসে। লেনিন প্রশ্ন করেছেন—'Are you free to your bourgeois publishers who demand from you pornography in the name of novel?' অর্থাৎ ব্যক্তি যেহেতু সামাজিক জীব, সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের ক্ষতি হয় এমন কিছু নির্মাণের স্বাধীনতা শিল্পীর নেই।

যৌনতা-উদ্দীপক অশ্লীল রচনা, যাকে লেনিন Pornography বলেছেন, তার কি বিনোদন-মূল্য নেই? থাকতে পারে, কিন্তু মার্কসবাদীরা এই বিনোদনকে 'escapist entertainment' বলেন। এই বিনোদন যেহেতু বিচারবুদ্ধিকে প্রসারিত করে না, প্রশ্ন করতে শেখায় না, বিনোদনের নামে চেতনাকে আবিষ্ট করে।

সাহিত্য, সিনেমা, টিভি সিরিয়াল যে সূত্রেই তা আমরা পাই না কেন—সেটা একটা নেশা, সেটা ক্ষতিকর। এই বিনোদন-উপকরণ সরবরাহ করার সময় শিল্পী তো তার পৃষ্ঠপোষকের কাছে স্বাধীনতার প্রশ্ন তোলে না। মার্কসবাদীরা তাই সামাজিক প্রয়োজনে, সমষ্টির স্বার্থে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ চান। কথাটাকে স্পষ্ট করে বলা যায়, মার্কসবাদী মতে শিল্পীর স্বাধীনতা আপেক্ষিক। সমাজ যত এগোয়, মানবচৈতন্য যত গভীর হয়, শিল্পীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি তত প্রসারিত হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে চলে আসে শিল্পকে হাতিয়ার হিসেবে দেখার যৌক্তিকতা। শিল্প সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে। রাশিয়ার বিপ্লবে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা'-এর প্রভাবের কথা থাক, স্টো-এর 'আঙ্কল টমস ক্যাবিন'-এর উদাহরণ টানা যেতে পারে। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন, যিনি ঊনবিংশ শতকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটান, স্টো-কে দেখে সবিস্ময়ে বলেছিলেন ঃ 'So you're the little woman who made the book that made the great war!' কিন্তু কোন গুণে শিল্প-সাহিত্য সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে সেটা বোঝা দরকার। শিল্প চেতনা-প্রসূত হলেও সে চেতনার উৎস যেহেতু যাপিত বাস্তব, মার্কসবাদীরা বাস্তবতা এবং শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে বিপ্লবের 'প্রগতিশীল' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল' চরিত্র বিচার করতে চান। বিষয়টিকে বোঝাতে গিয়ে Adorno বলেছেন, 'Art is the negative knowledge of the actual world।' যেহেতু যাপিত বাস্তব এবং মস্তিষ্কপ্রসূত বাস্তবের ছবি সম্পূর্ণ আলাদা, শিল্পের বাস্তব 'negative knowledge'। কিন্তু যেটা আদৌ উপেক্ষণীয় নয় তা হল, এটি পরোক্ষ জ্ঞান হলেও তা বাস্তবেরই জ্ঞান। অর্থাৎ বাস্তবকে উপেক্ষা করে শিল্প-সাহিত্য হতে পারে না; হলে তা উৎকৃষ্ট মানের নয়। আবার এই বাস্তবতার প্রশ্নেই শিল্পের বাস্তবতা Socialist Realism হবে, না কি Critical Realism হবে, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে। সোসালিস্ট রিয়েলিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্য শিল্পীর দায়বদ্ধতা, তার শ্রেণি-পক্ষপাত ও তার জনমুখীনতা (যথাক্রমে partinost, klassovost ও narodnost)। পুঁজিপতিরা শিল্পীর স্বাধীনতার আদর্শের কথা সগর্বে বলেও প্রকাশযন্ত্রটিকে পুঁজির সেবাদাসে পরিণত না করে বিশ্রাম নেয় না। পুঁজিবাদের অবসান যারা চায় তারা বিপরীত অবস্থান নিয়ে শিল্পের মধ্যে শোষিতের জীবনযন্ত্রণা ফুটে উঠুক, শোষকের কদর্যতা উন্মোচিত হোক—চাইতেই পারে। সেটা ততটা দোষের নয়, কারণ শোষণের বাস্তবতা তো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাস্তবের উপস্থাপনা মোটা দাগের হলে সেটা আর শিল্প থাকে না, প্রোপাগান্ডা হয়ে ওঠে। শ্রেণিচরিত্র ফোটাতে গিয়ে তথাকথিত প্রগতিবাদী ঘরানায় অনেক নিকৃষ্টমানের রচনা রচিত হয়েছে। এ-বিষয়ে মার্কসবাদীদের অবস্থান সুস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য। মার্গারেট হার্কেনসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস একটা 'pointblank socialist' উপন্যাসকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলে মানতে চাননি। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'The more the opinions of the author remain hidden, the better for the sake of art'। অর্থাৎ শ্রেণি-পক্ষপাত নেপথ্যে থাকাই ভালো। আর এক জায়গায় এঙ্গেলস tendenzroman বা পক্ষপাতদুষ্ট উপন্যাসের রচয়িতাকে বিদ্রূপ করে লিখেছেন ঃ 'Look at your heroine with her dialectical materialist eyes, and her economic determinist nose and her surplus value mouth. You take her in your arms and you kiss her. I know I wouldn't want to।' লেনিন, যিনি কিনা সাহিত্যকে সমাজবিপ্লবের চাকার দাঁত ('cog') বলে চিহ্নিত করেছেন, তিনিও কিন্তু বোধবুদ্ধিহীন 'cut and dried' শ্লোগান-ঠাসা সাহিত্যকে শুধু 'superficial' বা অগভীর নয়, 'fatal' বা মারাত্মক রকমভাবে ক্ষতিকর, বলেছেন।

শিল্পকে তাহলে হাতিয়ার হতে হবে, কিন্তু প্রোপাগান্ডা হলে চলবে না; শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকতে হবে, কিন্তু তা হতে হবে অপ্রকট; শিল্পীর স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু তা নিরঙ্কুশ হবে না; শিল্পকে বাস্তবসম্মত হতে হবে, কিন্তু সে বাস্তব স্থূল বাস্তব নয়, চেতনার রসে জারিত উচ্চমার্গের বাস্তব—এসব কি স্ব-বিরোধী কথা নয়? নিশ্চয়ই না, কিন্তু তা বুঝতে হলে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা দরকার। 'রাজা যত বলে পারিষদদলে বলে তার শতগুণ', এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। অনেক মার্কসবাদী তাত্ত্বিক দ্বান্দ্বিকতা বাদ দিয়ে যান্ত্রিকতার আশ্রয় নেন। সেটা দোষ, তাই তাঁরা 'vulgar Marxist' বলেই নিন্দিত। যাঁরা মার্কসবাদে গভীরভাবে দীক্ষিত, তাঁরা কিন্তু এসব কথাকে স্ব-বিরোধী না ভেবে এসবের মধ্যে নিহিত সত্যটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' বাক্যটাও তো আপাতবিরোধী। কিন্তু আমরা বাক্যটিকে প্রলাপ ভেবে উড়িয়ে না দিয়ে এর মর্মার্থ উদ্ধারে তৎপর হই। প্রকৃত মার্কসবাদ ক্ষুদ্রতাকে প্রশ্রয় দেয় না। লেনিন তাই 'proletarian culture'-এর কথা বলেও প্রাক্-প্রলেতারীয় সংস্কৃতিকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে চাননি। ব্যাদানোভের বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন যে, পূর্বতন ব্যবস্থা পাল্টানো মানে অতীতের যা-কিছু সম্পদ তা জলাঞ্জলি দেওয়া নয়। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি মানে এই নয় 'We should not take from them everything mankind has accumulated over the years।' দ্বান্দ্বিকতার নিয়মে পরস্পর-বিরোধী শক্তি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন সমীকরণ-বিন্দুতে পৌঁছায়। মার্কসবাদ তাই দ্বন্দ্বকে বুঝতে চায়, মীমাংসাসূত্র খুঁজতে চায়। বাস্তবতা ভালো, কিন্তু শিল্পের বাস্তবতা জীবনের হুবহু নকল নয়। এই বিরোধাভাস বোঝাতে Adorno শিল্পকে reflection না বলে revelation বলেছেন। উপমা পাল্টে বলা যায়, শিল্প ফটো নয়, আঁকা ছবি। প্রথমটিতে শুধু উপরিতলের (surface) রূপটি ধরা পড়ে; শিল্পীর তুলি কিন্তু উপরিতল ছাপিয়ে ভেতরের মানুষকে ধরার চেষ্টা করে। শিল্পে সমাজ পরিবর্তনের বার্তা থাকুক, কিন্তু সেটা যেন প্রোপাগান্ডার মতো বিজ্ঞাপিত না হয়, এটাই মার্কসীয়

অবস্থান। অর্থাৎ নিহিত বার্তাটি যেন উপলব্ধি থেকে ছেঁকে আনতে হয়, তা যেন অনায়াসলব্ধ না হয়, যেমনটা ঘটে প্রচারপুস্তিকায়। আবার ছেঁকে আনতে গিয়ে শিল্প যেন মুষ্টিমেয় তথাকথিত সমঝদারের জন্য উদ্দিষ্ট না হয়ে আমজনতার হৃদয়ে পৌঁছায়। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction' প্রবন্ধে প্রযুক্তির কল্যাণে Popularization-এর পথ যে সুগম হয়েছে তা দেখিয়েছেন। তবু লোকরঞ্জনই শিল্পের শেষ কথা নয়। ১৯৪২ সালে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় মাও জে দং এই দ্বন্দ্বটাকে সুন্দর করে ছুঁয়েছেন। তাঁর মতে, জনপ্রিয় হতে, আপামর মানুষের কাছে পৌঁছতে, শিল্পকে হয়তো নিজের উচ্চাসন থেকে কিছুটা নামত হবে, কিন্তু সেখানে থামলে চলবে না, চেতনার মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। তাঁর ভাষায় 'With us therefore raising of standards is based on popularization while popularization is guided by raising of standard।' অর্থাৎ দাঁত বেরুলে গলা-ভাতের প্রয়োজন নেই।

মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ, এর দৃষ্টিভঙ্গি খুব সংকীর্ণ—এখানে মানবতা, নৈতিকতার কোনো স্থান নেই, এ এক শ্রেণিশোষণকৈবল্যবাদ। বিষয়টা নিয়ে মার্কস থেকে মাও সবাই ভেবেছেন; কিন্তু তাঁরা ভাবের ঘরে চুরি করে উত্তর দেননি। লেনিন বলেছেন, 'We reject any morality based on extra-human and extra-class concepts।' শোষণের প্রতাপে সমাজ যেখানে দ্বি-খণ্ডিত, সেখানে বিশুদ্ধ নৈতিকতা বলে কিছু হয় নাকি? মাও বিষয়টাকে আরও প্রাঞ্জল করেছেন—শ্রেণিশোষণ বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিখাদ মানবতা আকাশকুসুম কল্পনা ৷৷ 'Classes have split the society into many antagonistic groupings; there will be love of all humanity when classes are eliminated।' তা হলে কি সমাজবাস্তবতার একটি মাত্র মানদণ্ডই শিল্পবিচারে প্রযুক্ত হবে? মাও তা চাননি। শিল্পের বক্তব্য ও তার গঠনশৈলীর (content এবং form) মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে সেটাও মাথায় রাখা দরকার। এই কথাটা মাও জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর মতে, বক্তব্য চাঁছাছোলা কিন্তু শৈলী দুর্বল, এমন শিল্প মনে দাগ কাটে না ৷৷ 'Works of art which lack artistic quality, have no force at all.' শিল্পবিচারে মার্কসবাদীরা একদেশদর্শী মোটেই নয়। তারা বক্তব্য ও আঙ্গিকের সহিতত্ত্ব, পরস্পরনির্ভরতা খুঁজতে চায়। তাই ভেজাল বক্তব্য আর খঞ্জ রচনাশৈলী উভয়ই তাঁদের কাছে সমানভাবে পরিত্যাজ্য। মাও জে দং-এর কথায় 'We oppose both the tendency to produce works of art with a wrong political viewpoint and the tendency towards 'the poster and slogan style' which is correct in political viewpoint but lacking in artistic power.' মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ, দ্বান্দ্বিকতার দৃষ্টিকোণ; এই কোণ থেকে দেখলে শিল্প-সাহিত্যের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, যা স্ববিরোধী মনে হয়েছিল, তা আর স্ববিরোধী থাকে না। দ্বন্দ্ব সর্বত্র, দ্বন্দ্বে অ্যালার্জি—এ বিরোধাভাসের মধ্যেই সম্ভবত লিওতার্দের কালাপাহাড়ি নাস্তিবাদের রহস্য লুকিয়ে আছে।

তথ্যসূত্র

১. অ্যাডোরনো, Aesthetics and Politics
২. এঙ্গেলস্, Letter to Margaret Harknes (April, 1888)
৩. লেনিন, Philosophilcal Notebooks, 'The Task of the Youth Leagues' (1920)
৪. মাও জে দং, 'Talks at the Yenan Forum on Literature and Art' (1943)
৫. মার্কস, Economic and Philosophical Manuscripts of 1844
৭. ওয়েস্ট, Crisis and Criticism

দার্শনিকরা পৃথিবীকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রয়োজন হল তার পরিবর্তনের।

—*কার্ল মার্কস*